লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ২০ রবি. আউ., ১৪৩৯ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ ঈসাব্দ

বায়তুল মুকাদ্দাস, জেরুযালেম
মুসলমানদের প্রথম কিবলা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

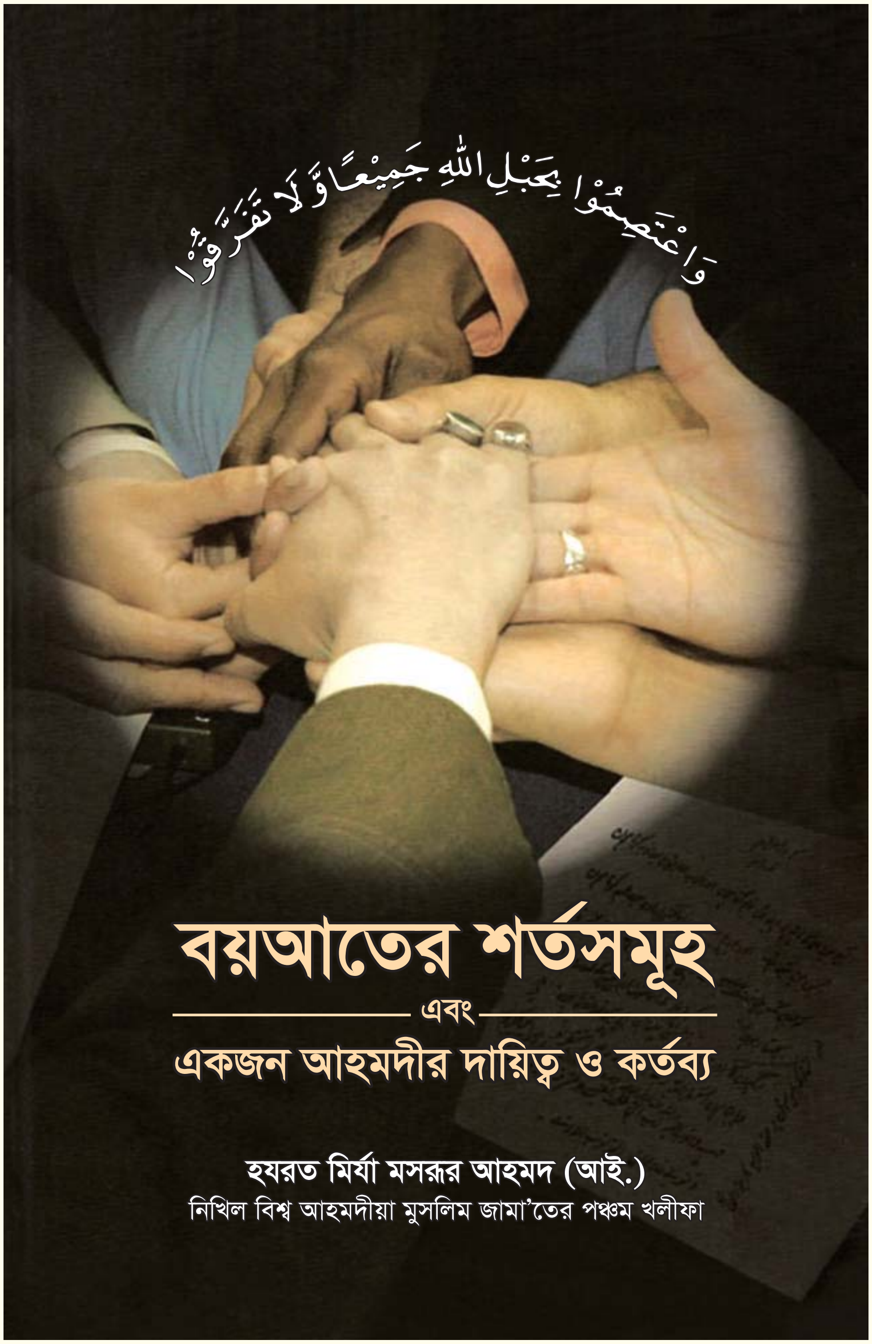

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

বয়আতের শর্তসমূহ

এবং

একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পঞ্চম খলীফা

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?

প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা-কে স্থায়ী অবলম্বন করে নাও

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, বিনা ব্যতিক্রমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে সচেষ্ট থাকবে, সদা দরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকবে, আর তা নিয়মিতভাবে করে যাবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– **ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাই'কাতাহু ইউসাল্লুনা আ'লান্নাবীয়ে ইয়া আই-ইউহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।** (সূরা আল আহযাব, ৩৩:৫৭)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তার ফিরিশ্তারা নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। হে লোক সকল! যারা ঈমান এনেছো তোমরাও তার ওপর দরূদ আর সালাম অধিক হারে প্রেরণ কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণনা রয়েছে– তিনি হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনলে তার উচ্চারিত বাক্যাবলী তোমরাও পুনরাবৃত্তি করো, যা সে আযানে বলে, এরপর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ করুণাবারি বর্ষণ করেন। তিনি (সা.) আরও বলেছেন– আল্লাহ্ তা'লার সকাশে আমার 'ওসীলা' হওয়ার জন্য আকুতি কর, যা জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহের মধ্যে একটি এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজন এটা লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি প্রত্যাশা রাখি যে আমি-ই হবো সেই ব্যক্তি।

যে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমার 'ওসীলা' হওয়ার জন্য দোয়া করবে তার জন্য শাফাআ'ত লাভ করাটা বৈধতা পাবে। [সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব আন ক্বওলু মিসান ক্বওলু মুয়জ্জিন লামিনাশ সামাআহু সুম্মা ইউসাল্লি আলান্নাবীয়ে (সা.)]

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এই সবগুলো আঙ্গিক দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। নিজের দোয়াকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গ্রহণীয়তার মর্যাদায় উপনীত করার জন্য আবশ্যকীয় হলো মহানবী (সা.)-এর ওসীলা হওয়ার জন্য দোয়া করা। এর সর্বোত্তম উপায় যেমনটি হাদিসে এসেছে আর যেমনটি কিনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও বলেছেন তাহলো অনেক বেশি সংখ্যায় দরূদ-শরীফ পাঠ করা।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক তা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

হযরত আমর বিন রাবিআ' (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন– যেই মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ পাঠে রত থাকে ততক্ষণ নাগাদ ফিরিশ্তারা তার ওপর আশিস বর্ষণ করে চলে। সেই দরূদ পাঠকারী তার ইচ্ছে মাফিক স্বল্প সময়ের জন্য দরূদ পাঠ করতে পারে আর ইচ্ছে হলে দীর্ঘ সময় ধরেও পড়তে পারে।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ তুমি তোমার আপনজন নবী (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ না কর ওখেকে কোন অংশই (খোদা তা'লার সকাশে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য) উর্ধ্বলোকে উন্নীত হয় না। [তিরিমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব-মা জাআ' ফি ফাসলুস সালাত আ'লান্নাবীয়ে (সা.)]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্য থেকে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দরূদ প্রেরণকারী ছিল। [প্রাগুক্ত হাদীস গ্রন্থ]

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞানের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"একবার এমন হয় যে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিমগ্ন রইলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অতীব সূক্ষ্ম, যা নবী করীম (সা.)-এর ওসীলা বা মধ্যবর্তীতা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– **ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা...** (আল মায়েদা, ৫:৩৬)। এভাবে একটা সময়-কাল অতিক্রান্ত হবার পর দিব্যদর্শনে আমি দেখলাম, দুইজন ভিস্তিওয়ালা অর্থাৎ পানির মশক বহনকারী আমার ঘরে প্রবেশ করলো, একজন অন্দর মহলের পথ হয়ে অপরজন বহির্মহল থেকে প্রবেশদ্বার দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলো আর তাদের কাঁধে ছিল 'নূরের মশক', আর তারা বলছিল হাযা বিমা সাল্লায়তা আ'লা মুহাম্মাদীন।" [হাকীকাতুল ওহী, টীকা, পৃ: ১২৮, রূহানী খাযায়েন ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৩১ এর টীকা]

অর্থাৎ এইসব কল্যাণ 'সেই দরূদ শরীফ' এর কারণে যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন: "দরূদ শরীফের বদৌলতে... আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে ঐশী কল্যাণরাজি বিস্ময়কর এক জ্যোতিরূপে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্পাতিত হচ্ছে আর সেখানে গিয়ে মহানবী(সা.)-এর বক্ষে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সেখান থেকে অসংখ্য আলোক রশ্মির ধারা নির্গত হয়ে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য অংশ পৌঁছে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ছাড়া কোন কল্যাণ কারও লাভ হতে পারে না।

[সম্পাদকীয়'র অবশিষ্টাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়]

সূচিপত্র

৩০ নভেম্বর, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ৯

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ১৮

ওয়াকফে জাদীদ-এর গুরুত্ব ও কল্যান ২৬
সম্পাদনা: শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩১
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৩৫
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ ৩৮
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

সংবাদ ৪১

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৩

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৪৪

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন–
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١٢﴾

১২। আর মানুষ এমনভাবে অকল্যাণ কামনা করে যেন সে কল্যাণ কামনা করছে[১৫৯৭]। আর মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াপ্রবণ।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا
آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ
فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٣﴾

১৩। আর আমরা রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। আর রাতের নিদর্শনকে মুছে দেই (এবং এটিকে দিনে বদলে দেই) আর আমরা দিনের নিদর্শনকে আলোকোজ্জ্বল করি, যাতে তোমরা (তোমাদের) প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং বছর গণনা ও হিসাব (বিজ্ঞান) শিখতে পার। আর[১৫৯৮] আমরা প্রতিটি বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ﴿١٤﴾

১৪। আর আমরা প্রত্যেক মানুষের 'আমলনামা' তার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছি[১৫৯৯]। আর কিয়ামত দিবসে এটিকে আমরা তার জন্য এমন এক পুস্তকাকারে বের করে আনবো, যেটাকে সে একেবারে খোলা অবস্থায় দেখতে পাবে।

[১৫৯৭] আরবী এ বাচনভঙ্গী এখানে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের অবস্থা এমনই যে, মুখের কথায় সে কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসৎ কর্ম দিয়ে সে তাঁর অসন্তুষ্টি ও আযাব আকর্ষণ করে। তার কর্ম তার কথাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। এ আয়াতের অর্থ এরূপও করা যেতে পারে যে, অকল্যাণকে মানুষ তেমনিভাবে ডেকে আনে, যেমন করে তার কল্যাণকে ডেকে আনা উচিত। উভয় প্রকার অনুবাদই এই ভাবার্থ প্রকাশ করে। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি পার্থিব দিক থেকে সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী এবং প্রতাপশালী হয়ে উঠে, তখন তারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলাপ্রবণ হয়ে উঠে এবং এ অবস্থাধীনে ক্ষমতা ও প্রতাপের দিনগুলোতেই তারা নিজেদের পতন ও মৃত্যুর ভিত্তি রচনা করে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপও হতে পারে যে, মানুষ মন্দ ও অমঙ্গলকে সেরূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহের সাথে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে, যেরূপে আল্লাহ তা'লা তাকে শুভ ও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করেন। এস্থলে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করার ক্রিয়াকে আল্লাহ তা'লার প্রতি আরোপ করতে হবে।

[১৫৯৮] রাত এবং দিন উভয়ের মাঝেই মানুষের জন্য উপকার এবং সুবিধা রয়েছে। কিন্তু রাতের উপকার সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট এবং দিনের উপকার ও সুবিধা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। এছাড়া দিন এবং রাতের পালাক্রমে আগমনের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো স্থির করতে বছরের দিনপঞ্জী সাহায্য করে। ঘটমান এ বিষয়াবলী মানুষকে গণিত বিজ্ঞানেও উন্নতি সাধনে পরিচালিত করে।

[১৫৯৯] আমলনামা মানুষের ঘাড়ে বেঁধে দেয়ার অর্থ : তার কর্ম এবং তার ফল তাকে ততদিন আঁকড়ে রাখে, যতদিন সে জীবিত থাকে। 'তায়ের' অর্থ পাখি। এর মর্ম হচ্ছে অভ্যাসগত কর্ম (আকরাব)। এ দ্বারা মানবকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমল বা কৃতকর্ম কখনো বিনাশ হয় না এবং এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, এমনকি মানব-চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকলেও তা গ্রীবালগ্ন হয়ে থাকে এবং একে মুছে ফেলা অসম্ভব। এ আয়াতের ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, মানুষ বহির্জগৎ থেকে শুভ-অশুভের সূচনা করে। পক্ষান্তরে শুভ ও অশুভের পূর্বলক্ষণ তার অন্তর্জগৎ থেকে সৃষ্ট হয়, যা অবিচ্ছেদ্যভাবে তার গ্রীবা সংলগ্ন হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফ

পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন মুসলমানদের কর্তব্য

> “একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।”

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে-কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করবেন। যে-কেউ মুসলমানের দোষ-ক্রুটি ঢেকে রাখে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার দোষক্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: এক মুসলমান আরেক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না, তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। মুসলমান এক ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অন্য এক মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে-কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে) নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন এবং যে-কেউ অন্যের সম্মান হানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মান হানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও তাকে রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: মুসলমান সে, যে সাক্ষ্য দেয় ‘আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল’। তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে (সেই মুসলমানকে) হত্যা করা বৈধ নয়। (এক) বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, (দুই) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে এবং (তিন) সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: দুই বান্দা, একজন প্রাচ্যের এবং অপরজন পাশ্চাত্যের, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য যদি তারা পরস্পরকে ভালবাসে, তবে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ– **মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ,**
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

এ যুগে নৈরাজ্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

> "নৈরাজ্যের উপ্চে-পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।"

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে, তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে, বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং এ অপদস্থ-ধর্মের প্রতি তোমরা করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল-পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধনসম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও। হ্যাঁ, সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য নাকি মিথ্যা? খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত আমরা দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে তারা ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বরং এ রীতির বিরোধীতা করে তারা হীন, পতিতবস্তু সদৃশ হয়ে গেছে।

আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে, এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবিই রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্চেপড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে, আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী-শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। ভয়াবহ এ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। একে অন্যের বিরুদ্ধে এরা দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। এদের মতভেদ দুর করার জন্য আল্লাহ তা'লা আমাকে মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই হচ্ছি খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

'বারাহীনে আহমদীয়া'

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

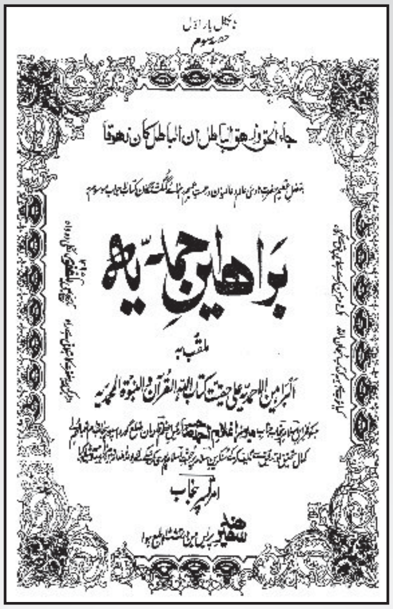

حصہ سوم

جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا

براہین احمدیہ

ملقب بہ

البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ

امرتسر پنجاب

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী

(৩৮তম কিস্তি)

কুরআন*(পাদটিকা-১) শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তা আদৌ হতভাগা জ্যেতিষীদের কথার মতো নয় বরং সেগুলোতে স্পষ্ট এক অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রতাপ উপচে পড়তে দেখা যায়। এতে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর রীতি এবং ধরন হলো, তা নিজের সম্মান আর শত্রুর লাঞ্ছনা, নিজের উন্নতি আর শত্রুর অবনতি, নিজের সফলতা আর শত্রুর ব্যর্থতা, নিজের বিজয় আর শত্রুর পরাজয়, নিজের চির সতেজতা আর শত্রুর ধ্বংস প্রকাশ করেছে। এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোন জ্যোতিষী করতে পারে কি? বা কোন ভাগ্য গণনা অথবা মিসমেরিজমের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে কি? মোটেই নয়। সর্বাবস্থায় নিজের মঙ্গল আর বিরোধীদের অমঙ্গল ও পতনের দাবি করা, বিরোধীর সকল কথাকে ব্যর্থ আখ্যা দেয়া আর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কথা পূর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া– এটি স্পষ্টত খোদারই মাহাত্ম্য, মানুষের কাজ নয়। এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমরা অদৃশ্য সংবাদ-সম্বলিত কুরআনের কিছু আয়াত উদাহরণ স্বরূপ অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করছি; যেন ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে আর সেসব ভবিষ্যদ্বাণী একসঙ্গে একস্থানে দেখে নিজেই বিচার-বিবেচনা করতে পারে যে, অদৃশ্যের এমন সংবাদ দেয়া সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া কোন মানুষের কাজ হতে পারে কি না? সংক্ষিপ্ত অনুবাদসহ সেই আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

الٓرٰ ۟ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِ ۝٢
اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنۡ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ
مِّنۡهُمۡ اَنۡ اَنۡذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا
اَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ قَالَ
الۡكٰفِرُوۡنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيۡنٌ ۝٣

এগুলো সেই গ্রন্থের আয়াত, যা সকল প্রকার প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের সমাহার। মানুষ কি একারণে আশ্চার্যান্বিত যে, আমরা

পাদটিকা-১: সম্প্রতি কসূরের মৌলভী আবু আবদুল্লাহ্ সাহেবের একটি পুস্তিকা ঘটনাক্রমে আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যার শেষ দিকে তিনি এলহাম ও ওহী সম্পর্কে নিজের কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তিকা রচনার পিছনে মৌলভী সাহেবের উদ্দেশ্য কী- তা যদিও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু মানুষ আমার কাছে যা বলেছে আর আমি তা পাঠে যা অবগত হয়েছি, সে অনুসারে ওলীউল্লাহ্দের প্রতি যে এলহাম হতে পারে, মৌলভী সাহেব তা অস্বীকার করেন বলে প্রতীয়মান হয়। والله أعلم بما في قلبهم তার হৃদয়ে কী আছে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যাহোক, আমি এ পুস্তিকা পাঠে যা বুঝেছি তাহলো, তিনি একটি আক্ষরিক বিতর্কের অবতারণা করে এলহাম সম্পর্কে লিখেছেন যে, অভিধানে এলহামের অর্থ হলো, الہام چیزے در دل انداختن و آنچہ خدا در دل اندازد

তাদের এক ব্যক্তির প্রতি এই ওহী করেছি যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে শুভসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে প্রশংসনীয় মর্যাদা রয়েছে? কাফিররা এই রসূল সম্পর্কে বলে যে, ‘এ এক স্পষ্ট যাদু’। (সূরা ইউনুস: ২-৩)

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ
اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٧

রসূলকে সম্বোধন করে তারা বলেছে যে, হে ঐ ব্যক্তি! যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি উন্মাদ। (সূরা হিজর: ৭)

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝٥٣
اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝٥٤

অনুরূপভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এমন কোন রসূল আসে নি, যাকে তারা যাদুকর বা উন্মাদ আখ্যা দেয় নি। এরা কি পরস্পরকে একই (আচরণের) ওসীয়ত বা তাকিদপূর্ণ নসীহত করে আসছিল? হ্যাঁ, বরং এ জাতিটাই সীমা লঙ্ঘনকারী। (সূরা যারিয়াত: ৫৩-৫৪)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝٣٠

সুতরাং তুমি তাদেরকে সত্য পথের কথা স্মরণ করানো অব্যাহত রাখ। খোদার কৃপায় তুমি গণকও নও আর তোমার ওপর জ্বীন বা উন্মাদনাও ভর করে নি। (সূরা তুর: ৩০)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى
اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيْرًا ۝٨٩

তাদেরকে বল, সমগ্র জ্বীন ও মানবকূলও□ যদি কুরআনের সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ লেখার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছে আর তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে, তবুও তারা তা কখনও বানাতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৯)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝٢٤
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ
اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝٢٥

আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা এ বিষয়ে কোনভাবে সন্দিহান হও অর্থাৎ যদি তোমরা মনে কর যে, সে নিজেই তা রচনা করেছে বা জ্বিনদের কাছে শিখেছে বা (যদি মনে কর) এটি এক প্রকার যাদু অথবা কবিতা বা যদি অন্য কোন ধরনের সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা এর একটি সূরার মত কিছু রচনা করে দেখাও। নিজেদের অন্যান্য সাহায্যকারী বা উপাস্যদের সাহায্যও নাও; যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি বানাতে না পার, যা তোমরা কখনও পারবে না; তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে অগ্নি ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ২৪-২৫)

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ۝٤
قُلْ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٥
بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۢ بَلِ افْتَرٰىهُ
بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ
اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٦

অস্বীকারকারীরা গোপনে পরস্পর এভাবে

পাদটিকা-১ চলমান: অর্থাৎ- এলহাম এমন একটি জিনিস, যা হৃদয়ে নিক্ষেপ করা হয় আর প্রকৃতপক্ষে খোদা তা’লাই এটি হৃদয়ে স্থাপন করেন। আর তড়িঘড়ি এ সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করে বসেছেন যে, এলহাম যেখানে কেবল হৃদয়ে উদ্ভূত ভালো বা মন্দ ধ্যানধারণার নাম, সেখানে এটি কোন ওলী বা পুণ্যবান বা ঈমানদার মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কেননা মানুষের হৃদয়ে নানা প্রকার ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়েই থাকে। আর পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার হৃদয়ে কোন ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয় না? এরপর মৌলভী সাহেব সংক্ষেপে অস্পষ্ট কিছু কথা লিখে তার বক্তব্যের ইতি টেনেছেন। পরিষ্কার করে ও স্পষ্টভাবে এমন কোন বাক্য লিখেন নি, যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হতো যে, মৌলভী সাহেব এ কথা মানেন ও স্বীকার করেন যে, ওলীআল্লাহ্ ও কামেল মু’মিনগণ খোদার সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখেন, আর খোদা যখন চান, তাদেরকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে কতক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং স্বীয় পবিত্র বাক্যাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেন। আর هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অনুসারে অন্যদের সে মর্যাদা লাভ হতে পারে না। এক কথায়, মৌলভী সাহেবের পুস্তিকায় বিধৃত লেখার রীতি হতে অবশ্যই এই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্‌র ওলীদের এলহাম সম্পর্কে তার মনে কিছুটা সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, যদি এটিই মৌলভী সাহেবের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা লেখা থেকে প্রতিভাত হয়, তাহলে মৌলভী সাহেব যে মহা ভুল করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌র ওলীরা ‘তাঁর পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত’- এ বিষয়টি অস্বীকার করা কোন মুসলমানের জন্য সম্ভব নয়, আর মৌলভী সাহেবদের ক্ষেত্রে এমন কথাতো ভাবাই যায় না। মৌলভী সাহেব কি জানেন না যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের সাথে এলহাম যোগে খোদার বাক্যালাপ হয়েছে? মরিয়মের সাথে এলহামে খোদার কথোপকথন, হাওয়ারীদের সাথে এলহাম যোগে খোদার বাক্যালাপের বিষয়টি স্বয়ং কুরআন শরীফে উল্লিখিত ও বর্ণিত রয়েছে, অথচ তাদের কেউই নবী-রসূল ছিলেন না। মৌলভী সাহেব যদি এই উত্তর প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌র ওলীরা তাঁর পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে আমরা বিশ্বাস রাখি ঠিকই, কিন্তু এর নাম এলহাম নয়, বরং ওহী। আমাদের মতে, এলহাম হৃদয়ের ধারণার নাম মাত্র; আর এ বিষয়ে মুমিন-কাফির, পাপাচারী ও পুণ্যবানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এতে কারো কোন বিশেষত্ব নেই, এটি কেবল শাব্দিক বিতর্ক- এ বিষয়েও মৌলভী সাহেব ভ্রান্তিতে নিপতিত। কেননা এলহাম শব্দ যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে নয়, বরং মুসলমান আলেমরা এটি যেভাবে বুঝেন, সে অর্থে এটি প্রযোজ্য। আদি থেকে আলেমদের এটিই রীতি যে, রিসালাত-সংক্রান্ত ওহী হোক বা অন্য কোন মু’মিনের প্রতি অবতীর্ণ ওহী-এলহামই হোক না কেন, তারা সব সময় এর অর্থ

একে অন্যকে প্রশ্ন করে যে, বার্তাবাহক হওয়ার দাবি যে করে, তার মাঝে বাড়তি কী যোগ্যতা আছে? তোমাদের মত একজন মানুষই তো। তাই তোমরা কী জেনেশুনে যাদু কবলিত হচ্ছ? পয়গম্বর (সা.) বলেন, আমার খোদা সবকিছু জানেন, হোক তা আকাশে বা ভূমিতে। নিজ সত্তায় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। কোন কথা তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না। কিন্তু কাফেররা নবীর কথার প্রতি কর্ণপাত করে না। তারা কুরআন সম্পর্কে বলে যে, এগুলো কিছু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন (বৈ কিছু নয়)। বরং এ কথাও বলে যে সে নিজেই তা বানিয়েছে। তাদের আরো একটি বচন হলো, ‘এ ব্যক্তি এক কবি’। যদি সে সত্য হয়, তাহলে আমাদের চোখের সামনে কোন নিদর্শন দেখাক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীরা প্রেরিত হয়েছে। (সূরা আম্বিয়া: ৪-৬)

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٨﴾

তড়িঘড়ি করা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। (সূরা আম্বিয়া: ৩৮)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٤﴾

অচিরেই তোমাদেরকে আমি আমার নিদর্শন দেখাবো। তাই আমার কাছে তড়িঘড়ি কোন নিদর্শন দাবি করো না। অচিরেই আমরা তাদেরকে বিশ্বের দিগন্তে নিদর্শন দেখাব এবং তাদের নিজেদের মাঝেই আমাদের নিদর্শন প্রকাশ পাবে আর এক পর্যায়ে সত্য তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ৫৪)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧١﴾

তারা কি বলে যে, সে বিকারগ্রস্ত? না, সত্য কথা হলো, খোদা তাদের প্রতি সত্য প্রেরণ করেছেন আর সেই সত্য গ্রহণে তারা অনীহা প্রকাশ করছে। (সূরা মু’মিনূন: ৭১)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٢﴾ؕ

খোদা যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করতেন, তা হলে স্বর্গ-মর্ত্য এবং এতে যা কিছু আছে, সবকিছু বিগড়ে যেতো বা সবকিছুর শৃংখলা হারিয়ে যেতো। বরং আমরা তাদের জন্য সেই পথনির্দেশনা এনেছি যার মুখাপেক্ষী তারা ছিল। সুতরাং তারা যে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী, তার প্রতিই তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। (সূরা মু’মিনূন: ৭২)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পাদটিকা-১ চলমান: এলহামই করে থাকেন। সর্বজনবিদিত এই বিষয় বা ‘ওরফ’কে কেবল সে-ই জানে না, সত্য গ্রহণের পথে কোন স্বার্থ যার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নতুবা কুরআনের শত শত তফসীর ও বেশ কয়েক সহস্র ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে কেউ কোন একটি রচনাও উপস্থাপন করতে পারবে না যাতে এ অর্থে এলহামের ব্যবহার অস্বীকার করা হয়েছে। বরং বিভিন্ন স্থানে মুফাস্‌সিরগণ ওহী শব্দের অর্থ ‘এলহাম’ করেছেন। অনেক হাদীসেও এ অর্থই দেখা যায়, যা সম্পর্কে মৌলভী সাহেব অনবহিত নন। তাই জানি না মৌলভী সাহেব কোথায় এবং কার কাছে শুনেছেন যে, ধর্মীয় পুস্তকে এলহাম শব্দের সে অর্থই করা উচিত, যা অভিধানে লিখিত আছে? অথচ আলেমদের বেশিরভাগ এলহামকে ওহীর প্রতিশব্দ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে একমত, আর মহানবী (সা.)ও এটি ব্যবহার করেছেন। তাই এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া চরম স্বেচ্ছাচার। মৌলভী সাহেব কি জানেন না যে শরিয়তে এ ধরনের শত শত সুপরিচিত বা সুবিদিত শব্দ রয়েছে যেগুলোর ভাবকে শাব্দিক অর্থের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা একটি বিভ্রান্তি। স্বয়ং ‘ওহী’ শব্দটিকে দেখুন; এর যেসব অর্থের আলোকে ঐশী গ্রন্থাবলী স্বর্গীয় বাণী আখ্যা পায়, তা অভিধানে কোথায় লেখা আছে? আর যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে খোদা নিজ প্রেরিতদের সাথে বাক্যালাপ করেন এবং তাদের প্রতি শিক্ষামালা অবতীর্ণ করেন, তা কোন্ অভিধানে লেখা আছে? একইভাবে, ইসলাম শব্দটি নিয়ে ভাবুন! এর একমাত্র আক্ষরিক অর্থ কারো প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত করা বা ঝগড়া বিবাদ পরিহার ও ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করা এবং আনুগত্য করা। এতে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** পড়তে হবে, তা কোথায় লেখা আছে? তাই সকল শব্দের সিদ্ধান্ত যদি অভিধান থেকে করতে হয়, তাহলে মৌলভী সাহেবের মতে ইসলাম শব্দের মর্ম হবে কেবল মীমাংসা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা। অন্য সব অর্থ তখন অবৈধ ও ভ্রান্ত আখ্যা পাবে। আমরা ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অদূরদর্শিতা থেকে খোদার আশ্রয় চাই। এক কথায়, এটি কারো অজানা নয় যে, ধর্মের জ্ঞান হোক বা বস্তু-জগতের জ্ঞান, অথবা অন্য কোন জ্ঞানই হোক না কেন, সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিভাষাগত সুবিদিত এমন শব্দ অবশ্যই ব্যবহার হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখার জন্য ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষাগত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এ জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যের হিতসাধন ও স্বয়ং উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু শব্দের অর্থ এসবের ‘ওরফ’ বা পরিচিত অর্থের নিরিখে নির্ধারণ করা ছাড়া আলেমদের কোন গত্যন্তর থাকে না, যা পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু মৌলভী সাহেব যদি আলেমদের ‘ওরফ’ বা জানা রীতি অনুসরণ করতে না চান, তাহলে ওলীদেরকে খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অদৃশ্য সংবাদের নাম তিনি ওহীয়ে এত্তেলা (সংবাদ প্রদান-মূলক) এবং ওহীয়ে এলাম (অবগতি-মূলক) রাখুন। কিন্তু তার জন্য এ কথা স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয় যে, তার ও মুসলমানদের অন্য জামা’তগুলোর মাঝে বিতণ্ডা কেবল শাব্দিক, অর্থাৎ যে সকল ঐশী বিষয়ের নাম আমরা (অর্থাৎ মৌলভী সাহেব) ওহী রাখি, অন্যান্য মুসলমান আলেমরা সেসবকে এলহামও আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের ও আমাদের মাঝে শতভাগ মতৈক্য রয়েছে– যেন মানুষ তার সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত না থাকে, আর তার সন্দেহের দোলাচলে দোদুল্যমান কথা যেন নৈরাজ্যের কারণ না হয়। আর কোন মুসলমানের সাথে খোদা এলহামের মাধ্যমে বাক্যালাপ করেন বলে যদি মৌলভী সাহেবের সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে এ অধম খোদার কৃপা ও তাঁর রহমতে আর আয়াত وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অনুসারে নমুনাস্বরূপ এমন এলহাম উপস্থাপন করতে পারে, যার মাধ্যমে স্বয়ং এ অধম সম্মানিত হয়েছে এবং যার সুবাদে মৌলভী সাহেব পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন ও প্রশান্তি পেতে পারেন, বরং নিশ্চিত হতে পারেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে মৌলভী সাহেব অবগত হবেন যে, এসব ঐশী জ্ঞান ও স্বর্গীয় রহস্য যা মুসলমানদের উপর নিশ্চিত ও অকাট্য এলহামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়, ইসলাম-বিরোধীদের ভাগ্যে তা কখনো জুটতে পারে না, আর কখনো জোটেও নি। ইসলামের কোন বিরোধীর এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কথা বলার জো নেই। (চলবে)

জুমুআর খুতবা

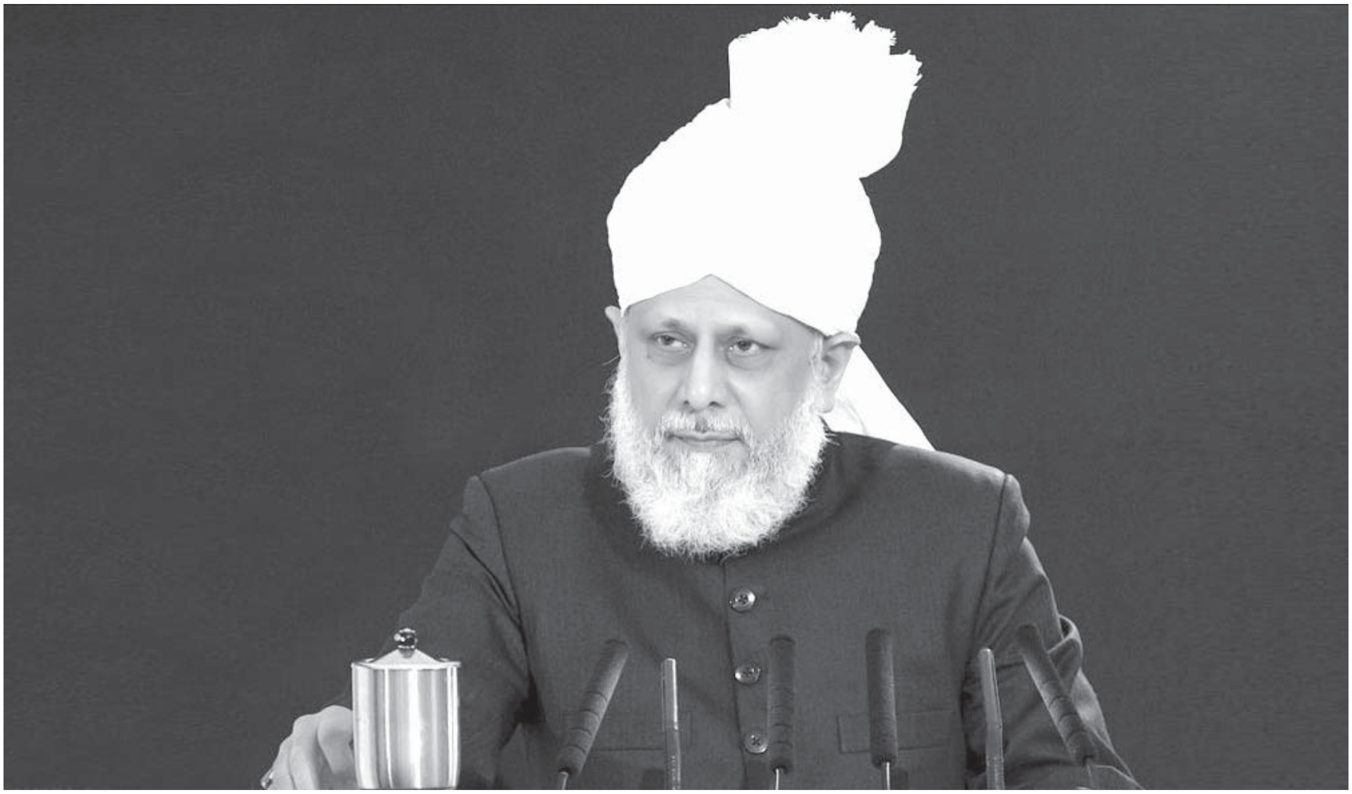

ইসলামের সেবায় আহ্‌মদীদের আর্থিক কুরবানী ও ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পরহুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর কোন কোন সময় সে দান-সদকাও করে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন কোন সংগঠন নেই, এমন কোন দল নেই, যার সদস্য ও সভ্যরা পৃথিবীর সকল দেশে সকল শহরে একই লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে আর সেই লক্ষ্যটি হল, ধর্ম প্রচার এবং সৃষ্টির সেবা করা। হ্যাঁ, আজকে ধরাপৃষ্ঠে কেবলমাত্র একটিই জামা'ত রয়েছে, যারা এই কাজ করে চলেছে। আর এটি সেই জামা'ত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি সেই জামা'ত, যা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামা'ত। এটি সেই জামা'ত' যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামা'ত, যার ওপর সারা বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামা'ত গত প্রায় ১২৮ বছর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার মানসে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে যাচ্ছে আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামা'তকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে ধনসম্পদের সঠিক ব্যয়স্থল এবং ধনসম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আমি বারংবার তাগিদ দেই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ, (এটি করার পেছনে খোদার নির্দেশে রয়েছে।) কেননা, ইসলাম এখন অধঃপতনের শিকার। এর বাইরের ও এর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। আর ইসলাম অন্যান্য বিরোধী-ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে।" তিনি

(আ.) বলেন, “পরিস্থিতি যেখানে এরূপ হয়ে গেছে, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য আমরা কি কোন পদক্ষেপ নেব না? এ উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খোদার নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছার অনুগমন করা বৈ অন্য কিছু কী।”

অতঃপর, তিনি (আ.) আরো বলেন, “এসব প্রতিশ্রুতিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই যে, যে ব্যক্তি খোদার পথে দান করবে, আমি তা বহুগুণে বর্ধিত করব। পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে আর পারলৌকিক প্রতিদান যে কত সুখকর, মৃত্যুর পর সেই অভিজ্ঞতাও সে লাভ করবে। বস্তুত, আমি এ বিষয়ের প্রতি তোমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় কর।” (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ:৩৯৩-৩৯৪)

অতএব, তাঁর সাহাবীরা (রা.) এসব কথা বুঝতে পেরেছেন আর নিজেদের সম্পদ তারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীরা কতটা অসাধারণভাবে অগ্রগামী ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উল্লেখ বেশ কয়েক স্থানে করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের জন্য (আর্থিক কুরবানীর) আহবান যখন করা হয়, অনেক খাতেই তিনি (আর্থিক কুরবানীর) আহবান জানাতেন, বই-পুস্তক ছাপাসহ অন্যান্য আরো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) তখন তাহরীক করতেন। একইভাবে, মিনারাতুল মসীহ্‌র জন্যও যখন তিনি আহ্বান জানান, তখন মুন্সী আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেব, বরং দু'জনের কথা তিনি বলেছেন অর্থাৎ আব্দুল আযীয সাহেব এবং শাদী খান সাহেব, যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন “আমার জামা'তের দু'জন এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ কাজের জন্য চাঁদা দিয়েছেন, যা অন্য বন্ধুদের জন্য সত্যিই ঈর্ষণীয় ব্যাপার। তাদের একজন হলেন, মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব, গুরুদাসপুর জেলায় তিনি পাটওয়ারীর কাজ করেন; অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এ কাজের জন্য ১০০ রুপী চাঁদা প্রদান করেন। আর আমি মনে করি, এই ১০০ রুপী তার বেশ কয়েক বছরের সঞ্চয় ।আর এজন্যও তিনি সমধিক প্রশংসার যোগ্য। কেননা অন্য একটি কাজের জন্যও সম্প্রতি তিনি ১০০ রুপীচাঁদা প্রদান করেছেন।” তিনি (আ.) আরো বলেন, “দ্বিতীয় যে নিষ্ঠাবান এক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তিনি হলেন শিয়ালকোট নিবাসী, লাকড়ী ব্যবসায়ী মিয়াঁ শাদী খান সাহেব। সম্প্রতি তিনিও অন্য একটি কাজের জন্য ১৫০ রুপী চাঁদা দিয়েছেন আর এখন এ কাজের জন্য ২০০ রুপী চাঁদা পাঠিয়েছেন। তিনি খোদার সত্তায় নির্ভরশীল সেই ব্যক্তি, যার ঘরের পুরো আসবাবপত্র, ইত্যাদি খতিয়ে দেখলে সম্পদের মোটমূল্য ৫০ রুপীর বেশি হয়তো হবে না।” “তিনি লিখেছেন, যেহেতু এটি দুর্ভিক্ষের সময় আর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্পষ্টতই চরম মন্দা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই আমাদের জন্য ধর্মীয়-ব্যবসা করাই মনে হয় শ্রেয়তর। কাজেই, যা কিছু আমাদের কাছে ছিল, সবই পাঠিয়ে দিলাম।” (মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

এভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থাদি ও মলফুযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিভিন্ন আর্থিক কুরবানী করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা আর উদ্দীপনা এত অসাধারণভাবে বিদ্যমান যে, প্রজন্ম পরম্পরায় তারা এমনটি করে যাচ্ছে। বরং যারা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী, পরে এসে যারা জামা'তে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও এসব পুণ্যবানের আর্থিক কুরবানীর কথা যখন শোনেন আর অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে একথা যখন শোনেন এবং খোদার বাণী শুনে যখন কুরবানীর বা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করেন, তখন তারাও এমনসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ধনাঢ্যদের চেয়ে মধ্যবিত্তরা, বরং দরিদ্ররা বেশি কুরবানী পেশ করে থাকে আর ত্যাগের বিস্ময়করসব দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে। তাদের মাথায় এ চিন্তা আসে না যে, আমাদের সামান্য আর্থিক ত্যাগস্বীকারে কীইবা লাভ হবে? বরং তারা খোদার এ বাণী বুঝেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ
اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۶﴾

(সূরা আল্ বাকারা: ২৬৬) অর্থাৎ, আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায়, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তাহলে শিশিরই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ, আল্লাহ্ এর সম্যক দ্রষ্টা।

অতএব, এসব দরিদ্র মানুষের কুরবানী ‘ত্বাল’ অর্থাৎ শিশিরের ন্যায়। সামান্য এই আর্দ্রতা বা পানি, যা তাদের যৎসামান্য কুরবানীর ফলে ধর্মের বাগানে সিঞ্চিত হয়, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়তা তা অগণিত ফল বয়ে আনে। আমরা দেখি, একটি দরিদ্র জামা'ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ সৃষ্টি করেন যে, বিশ্বের মানুষ এই ভেবে অবাক হয় যে, এত সীমিত উৎস আর সাধ্যের মধ্যে থেকেও এতসব কাজ কীভাবে তোমরা সাধন করতে পার? এটি সম্ভব হওয়ার কারণ হল ত্যাগী এ সব ব্যক্তি ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিচ্ছেন যে,

يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তারা নিজেদের ধনসম্পদ খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যয় করে। আর খোদার সন্তুষ্টিই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে ফলও লাভ হয় অনেক আর তা কল্যাণও বয়ে আনে প্রচুর। যেমনটি আমি বলেছি, আজও এসব কুরবানীর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং অগণিত দৃষ্টান্ত আছে, যার কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী এক মেয়ে যখন আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়, তখন তার চিন্তাধারায় কেমনতর পরিবর্তন আসে, আর কুরবানীর কী

অসাধারণ জ্ঞান তার অর্জিত হয়, এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা সেই মেয়ের নিজ ভাষ্যে শুনুন। এই মেয়েটি উগান্ডার অধিবাসীনি। সে অশিক্ষিত নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে বলে, গত জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তার কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করার প্রয়োজন পড়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ অপর্যাপ্ত ছিল আর চাঁদাও ছিল বকেয়া। কাজেই সেই অর্থ আমি চাঁদা হিসেবেই দিয়ে দেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। এছাড়াও আমি আমার চাঁদা দিতে পেরে প্রশান্তি বোধ করছিলাম। এক মাস পর অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তখনও তিন দিন বাকি, আমার এক খালা আমার মাকে ফোন করে জানতে চান, আমি কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি আর একই সাথে তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। সন্ধ্যাবেলা আমি তার বাড়িতে গেলে তিনি আমাকে কিছু অর্থ দেন, যা ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি আর চাঁদা হিসেবে আমি যা দিয়েছিলাম, এ অর্থ ছিল তার চেয়ে দশগুণ বেশি। এভাবে খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন আর এমন স্থান থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন, যেখান থেকে অর্থ আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ভারতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার ইন্সপেক্টর কমর উদ্দীন সাহেব লিখেন, কেরালার মুঞ্জেরী জামা'তের একজন সদস্যের রেক্সিনের (Rexine) ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যখন তার দোকানে যাই, তখন তিনি বলেন, মানুষের কাছে তার অনেক পাওনা টাকা আটকে আছে আর এ কারণে তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মোটা অঙ্কের এক চেক প্রদান করতে গিয়ে বলেন, এখন একাউন্টে এত টাকা নেই, কিন্তু দোয়া করবেন আমি যেন অচিরেই এই অর্থ পরিশোধ করতে পারি। তিনি বলেন, পরের দিনই তার ফোন আসে যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় চেক দেয়ার পরক্ষণেই আমার একাউন্টে অনেক বড় অঙ্কর টাকা জমা হয়েছে, তাই আপনি আপনার চেকটি ক্যাশ করিয়ে নিন। আর বলতে থাকেন, এটি একান্তই চাঁদার কল্যাণে সম্ভব হয়েছে, এত স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ায় বসবাসকারিনি এক বিধবা মহিলার দৃষ্টান্ত, যার সম্পর্কে তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আড়েঙ্গা শহরের মুয়াল্লিম সাহেব জনৈকা বিধবা মহিলা আমিনার কাছে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান। তিনি (মহিলা) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এখন আমার কাছে কিছুই নেই, কোন ব্যবস্থা হতেই সে-অর্থ নিয়ে আমি স্বয়ং আপনার কাছে উপস্থিত হব। মুয়াল্লিম সাহেব তখনও বাড়ি পৌঁছেন নি, এর পূর্বেই সেই ভদ্রমহিলা দশ হাজার শিলিং নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ অর্থ কোন এক স্থান থেকে এসেছে, তাই ভাবলাম, আপনাকে দিয়ে আসি। প্রথমে চাঁদা দেই, অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা পরে হবে। তিনি বলেন, আমার ওয়াদা ছিল পঁচিশ হাজার, কোন ব্যবস্থা হতেই বাকি পনের হাজার আমি নিয়ে আসব। দশ মিনিট পর তিনি পুনরায় অর্থ নিয়ে আসেন আর বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যবহার দেখুন! আল্লাহ্‌র পথে আমি যে দশ হাজার দিয়ে গিয়েছিলাম, বাড়ি পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঠিয়ে দিয়েছেন, যা থেকে পনের হাজার বকেয়া চাঁদা প্রদানের পরও আমার কাছে বিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেয়ারই কল্যাণ। আর এভাবে তার ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করেছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার একটি দেশ হল কঙ্গো। সেখানকার লোকদের মাঝে কীভাবে কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে আর ত্যাগের চেতনায় তারা কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে, এরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সেখানকার মুবাল্লিগ রমিয সাহেব লিখেছেন, কালোমবাই (Kalombayi) জামা'তের একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ সাঈদী সাহেব পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জামা'ত সফর করেন এবং তবলীগ করেন। বর্তমানে সে দেশের অবস্থা ভালো নয়। নিরাপত্তা জনিত আশঙ্কা থাকলেও নিজ কর্মগণ্ডির সবক'টি জামা'ত তিনি সফর করেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও পুণ্যের খাতিরে সফরের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেন। এই সফরে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে স্থানীয় মুদ্রায় তিনি তিপ্পান্ন হাজার স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে জমা করান আর বলেন, আমি একজন পুরোনো আহমদী, যুবকদের জন্য আমার নমুনা আদর্শ-স্থানীয় হওয়া চাই। সেখানকার পুরোনো আহমদী বলতে কত পুরোনো হবে? খুব বেশি হলে পনের-বিশ বছর। তার বয়স ৬০ বছরের বেশিই হবে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে তবলীগের কাজ করছেন আর এর পাশাপাশি চাঁদার প্রতিও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই হল সেই প্রেরণা ও চেতনা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-কে গ্রহণের পর এসব লোকের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এরা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন। এমন অঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে রাস্তাঘাটের ভালো সুবিধে নেই, এমনকি যথার্থ রাস্তাঘাটও নেই। নদীমাতৃক অঞ্চল তাই নৌকাতেই সফর করা হয় আর এক স্থান থেকে অপর স্থানের দূরত্ব অনেক বেশি।

পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের এক আহমদীর দৃষ্টান্ত দেখুন! তার আহমদীয়াতের বয়স এখনো বছরও পেরোয় নি। অথচ দেখুন, তার কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা কত উন্নতমানের! বরং পুরোনো আহমদীদের জন্য এটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। সেখানকার মুবাল্লিগ মুজাফ্‌ফর সাহেব লিখেন, কুতুনী অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল ডিকাম্বে (Dekambe)। সেখানে এবছর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে বিক্রি করে। তারা জেলে আর তাদের জীবন-জীবিকা এভাবেই নির্বাহ হয়। স্থানীয় মুবাল্লিগ সেই গ্রামবাসীদেরকে চাঁদার তাহরীক করলে এক আহমদী বন্ধু, যিনি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, তিনি অনিতিবিলম্বে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক হাজার ফ্রাঙ্ক কুরবানী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমার অবস্থা যদিও ততটা স্বচ্ছল নয়, কিন্তু আমি চাই না, যে জামা'তে আমি যোগ দিয়েছি, সে জামা'তের পক্ষ থেকে কোন তাহরীক করা হবে আর আমি তাতে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাব।

এরপর খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং খুতবার প্রভাব মানুষের ওপর কীভাবে পড়ে আর কুরবানীর প্রতি কীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, তাও দেখুন! পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনাফাঁসোর কয়েকজন যুবকের দৃষ্টান্ত এটি। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তত পুরোনো নয়, কিন্তু তাদের মান কোন পর্যায়ের, তা দেখুন! সেখানকার মুবাল্লিগ আমীন বালুচ সাহেব লিখেন ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ সনের খুতবা গত বছরের শেষ খুতবা ছিল। আর নববর্ষের সূচনার বরাতে আমি যে খুতবা দিয়েছিলাম, তা শুনে সেখানকার অর্থাৎ, বানফুরা অঞ্চলের কয়েকজন যুবক, যারা নতুন আহমদী ছিল আর কিছু পুরোনো আহমদীও খুতবা শোনার পর তাৎক্ষণিক বাড়ি যান এবং নববর্ষ বরণের জন্য যা কিছু সংগ্রহ

করেছিলেন, তা নিয়ে আসেন আর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন এবং বলেন, যুগ-খলীফা যেহেতু আমাদেরকে বর্ষবরণ ও উদযাপনের রীতি শিখিয়েছেন, তাই এই অর্থ আমরা চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি এবং রাতে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আমরা বর্ষবরণ করব। আর এভাবে সেদিন তারা প্রায় ৭৬,০০০ ফ্রাঙ্ক সীফা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।

পশ্চিম আফ্রিকারই আরেকটি দেশ আইভরিকোস্টের ছোট্ট একটি গ্রামের নতুন জামাতের লোকদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখুন! বুওয়াকে অঞ্চলের মুয়াল্লিম মামাদু সাহেব লিখেন, আমাদের অঞ্চলের একটি গ্রাম নিয়াভোগো’র (Niavogo) লোকেরা এ বছরই আহমদীয়া জামা’তের অন্তর্ভুক্ত হন, সবেমাত্র এক বছর হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নতুন বয়আতকারীদেরকে ওয়াক্‌ফে জাদীদে অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক জলসায় যোগদানের তাহরীক করি। সেসব নবাগতকে বলি, যুগ খলীফা বলেছেন, সব আহমদী যেন ওয়াক্‌ফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল, হয়তো গুটিকতক মানুষ সামান্য কিছু পরিমাণ চাঁদা এ খাতে দিবে। কেননা, তারা চরম দারিদ্রের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে; কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে। আর এক বন্ধু শুধু চাঁদাই দেন নি, বরং ৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আবিদজানের বার্ষিক জলসায়ও যোগদান করেন।

কুরবানীর আরেকটি দৃষ্টান্ত এবং খোদার ব্যবহার দেখুন! তানজানিয়া থেকে মুবাল্লিগ ইউসুফ ওসমান সাহেব লিখেন, হাঁটতে অক্ষম একজন আহমদী ভাই, পঙ্গুত্বের কারণে সে কোন কাজ করতে পারে না, তানজানিয়ার সকল অঞ্চলে এখনো বিদ্যুত যায় নি। তাই কিছু কিছু মানুষ ছোট ছোট সোলার প্যানেল বা সৌর বিদ্যুতের প্যানেল ক্রয় করে নিজেদের ঘরে দু’একটি বাল্ব জ্বালানোর ব্যবস্থা করেন। আমাদের এই আহমদী ভাইও ছোট্ট একটি সোলার প্যানেল দিয়ে মানুষের মোবাইল চার্জ করে দেন আর এভাবে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। সামান্য যে আয় হয়, সেই আয় অনুসারে রীতিমত চাঁদাও দেন। আমাদের মুয়াল্লিম একদিন চাঁদার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, গত দু’দিনে আমার দু’হাজার শিলিং আয় হয়েছে, আমি আল্লাহ্ তা’লার পথে তাই প্রদান করছি। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, যদি পুরো অর্থই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, তাহলে ঘরে স্ত্রী-বাচ্চাদেরকে কী খাওয়াবেন? তিনি বলেন, খোদা তা’লা ‘রাযেক’, তিনি নিজেই কোন ব্যবস্থা করবেন। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আমি চাঁদার রশীদ কেটে দেয়ার পরপরই অনেকে তার কাছে মোবাইল চার্জ করার জন্য আসে এবং যতটা চাঁদা তিনি দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আয় হয়। তখন সেই আহমদী ভাই মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, আপনি দেখেছেন, চাঁদা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা’লা কত বরকত দিয়েছেন যে, যা আমি দিয়েছি, এখনই তার চেয়ে বেশি অর্থ তিনি আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ্ কীভাবে ত্যাগী লোকদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন, তার এক দৃষ্টান্ত দেখুন! তানজানিয়ার শিয়ানিগা অঞ্চলের একটি জামা’তের এক বন্ধুর পুত্র মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। পুত্রের চিকিৎসার জন্য তার কাছে মাত্র ১৫০০ শিলিং ছিল। সেক্রেটারী মাল তার বাড়ি গিয়ে চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই অর্থই পকেট থেকে বের করে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এরপর সেই বন্ধু (অর্থাৎ রোগীর পিতা) বলেন, প্রথমে আমার চিন্তা হল ছেলের চিকিৎসার অর্থ কোথা থেকে আসবে? কিন্তু পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছি, আল্লাহ্ তা’লাই ব্যবস্থা করবেন। কিছুক্ষণ পর অন্য এক শহর থেকে তার বড় পুত্র ফোন করে বলেন, আমি ৮০,০০০ শিলিং পাঠাচ্ছি আর এই অর্থ সেদিনই তার হস্তগত হয়। ছেলের চিকিৎসা খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা’লাকে (যা দিয়েছি) তার চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি আমাকে ফেরত দিয়েছেন। এখন তিনি এই ঘটনা অন্যদেরকেও, তথা স্থানীয় আহমদীদেরকে শোনান এবং তাদের সামনে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করেন।

পশ্চিম আফ্রিকার আরেক দেশ মালীর এক ব্যক্তির আর্থিক কুরবানীর ঘটনা শুনুন। মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখেন, সাকাসু অঞ্চলের এক বন্ধু ২০১৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের সময় তিনি চরম আর্থিক সংকটে জর্জরিত ছিলেন। ঋণগ্রস্ততা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সমস্যা তার ছিল আর তার অবসর গ্রহণের সময়ও ঘনিয়ে আসছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি যখন চাঁদার বরকতের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি মনে মনে অঙ্গীকার করেন যে, রীতিমত চাঁদা দিবেন আর বাস্তবেও এমনটিই করেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্য অনুসারে চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আল্লাহ্‌র কৃপায় স্বল্পতম সময়ে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায় আর পারিবারিক দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। আমার অবসর গ্রহণের সময়ও পিছিয়ে দেওয়া হয়। এখন তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সিয়েরালিওন থেকে মুবাল্লিগ মুনীর হোসেন সাহেব লিখেন, বোয়াজেবুর (Boajibu) একটি জামা’তের এক আহমদী ভদ্রমহিলা চার হাজার লিওন দেওয়ার ওয়াদা করেন অথচ তার আয়ের তেমন কোন উৎস ছিল না। কেবল ছোট্ট একটি বাগান ছিল, যেখানে তিনি কাসাভা চাষ করেছিলেন। মিষ্টি আলুর ন্যায় এর দীর্ঘ শিকড় গজায়, এটিই খাওয়া হয়। সেটা বিক্রি করেই তিনি দিনাতিপাত করতেন। চাঁদা দেয়ার সময় ঘনিয়ে এলে সেক্রেটারী সাহেব চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার কাছে যান। চাঁদার জন্য যে অর্থ তিনি একত্রিত করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তার কোন ছেলে তা নিয়ে যায় এবং খরচ করে ফেলে। এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখুন! তার এক পুত্র মদের দোকানে কাজ করত, অপারগতা ছিল বা পুরোপুরি ঈমান আনে নি। সে বলে, ঋণ হিসেবে আমি এই অঙ্ক আপনাকে দিচ্ছি। সেই মা পরিষ্কারভাবে তা নিতে অস্বীকার করেন আর বলেন, এই অর্থ বৈধ নয়। তাই চাঁদা হিসেবে এই অর্থ আমি দিতে পারি না। এ হল তার ঈমানী আত্মাভিমান। কিন্তু প্রত্যুত্তরে খোদার ব্যবহারও দেখুন! বান্দার উদ্দেশ্যই ছিল খোদার সন্তুষ্টি লাভ আর তাই আল্লাহ্ তা’লা ব্যবহারও করেছেন অভাবনীয়! তিনি বলেন, ইত্যবসরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি আসে, যাকে তিনি আদৌ চিনতেন না। সেই ব্যক্তি তাকে ১০০০০ লিওন দেন। ৪০০০ লিওন দেয়ার পরিবর্তে ১০০০০ লিওন তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর বলেন, শুধুমাত্র চাঁদা পরিশোধ করার জন্যই আল্লাহ্ তা’লা এই অঙ্ক আমাকে পাঠিয়েছেন।

পরবর্তী বছরের জন্যও তিনি ১০০০০ লিওন ওয়াদা লিখান।

সিয়েরালিওন থেকেই মুবাল্লিগ আকীল সাহেব বলেন, বুঁ অঞ্চলের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধুর দীর্ঘদিন থেকে জমিজিরাত সংক্রান্ত বিবাদ চলে আসছিল আর বিবাদি পক্ষ ছিল খুবই প্রভাবশালী। মামলায় জেতার মত বাহ্যত কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি তার ছিল না। সে সময় মসজিদে তিনি আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ সম্পর্কে শুনেন। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণের কথা যখন শুনলাম, ভাবলাম আমিও চাঁদা দিয়ে দেখি। নতুন এই বয়আতকারী খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, হতে পারে, এই চাঁদার কল্যাণে আমার জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই সাধ্যানুসারে চাঁদা প্রদান করেন। এর কিছুদিন পরেই মামলার রায় তার অনুকূলে যায়, যা বাহ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। এই বন্ধু বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সবকিছুই আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে হয়েছে।

কঙ্গো কিনশাসার মুবাল্লিগ শাহেদ সাহেব লিখেন– এক ভদ্রমহিলা, যার ক্ষুদ্র একটি ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বছরের শুরুতেই মনে হচ্ছিল, ব্যবসায় লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বছরের প্রারম্ভেই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দেই আর চিন্তা করি, খোদার সাথে কৃত ব্যবসা কখনো লোকসানে পর্যবসিত হতে পারে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার ব্যবসায় লাভ হয়। দেশে বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার ব্যবসায় কোন লোকসান হয় নি।

আহমদীদের বিভিন্ন কুরবানীর প্রভাব অন্যদের ওপরও কতটা পড়ে তা দেখুন আর এর ফলে তবলীগের পথও সুগম হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আমীর সাহেব লিখেন– তিনজন যেরে তবলীগ বন্ধু, যথেষ্ট তবলীগ করা সত্ত্বেও বয়আতের জন্য কেউ সম্মত হচ্ছিল না। গত জুমুআয় এই তিন বন্ধু মসজিদে আসেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের বরাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে জুমুআর পর মানুষ চাঁদা দেয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যেরে তবলীগ এই বন্ধুরা এ দৃশ্য দেখে বলেন, চাঁদা নেওয়ার জন্য বক্তৃতা করতে করতে আমাদের মৌলভীদের গলা, মুখ সবই শুকিয়ে যায়, তবুও মানুষ চাঁদা দেয় না। আর এখানে সামান্য একটি ঘোষণার পর চাঁদা দেয়ার জন্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এটিই প্রকৃত ইসলামিক প্রেরণা। অতএব, এ দৃশ্য দেখার পর এই তিন বন্ধু তখনই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদাও প্রদান করেন।

এরপর বেনিনের একটি অঞ্চলের মুয়াল্লিম আব্দুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, সদ্য বয়আতকারী একটি জামা'ত পাপাযা'য় (Kpakpaza) চাঁদা সংগ্রহের জন্য সফর করি। নতুন একজন বয়আতকারী আহমদী আলহাজ্ব আবু বকর সাহেব বলেন, এই চাঁদা কোথায় এবং কীভাবে খরচ করা হয়? জামা'তের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো জ্ঞান তার ছিল না। তাকে তখন বলা হয় যে, এসব চাঁদার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত মসজিদ নির্মাণ করে, কুরআনের অনুবাদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রচার করে এবং বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল এবং এতিমখানা নির্মাণ করা হয়। চাঁদা হিসেবে প্রদত্ত এক একটি পয়সা শতভাগ ধর্মীয় এবং মানব-কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। একথা শোনার পর আবু বকর সাহেব বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে যাকাত এবং খয়রাত নেয়ার জন্য আসত। কিন্তু কখনো তারা বলে নি যে, সেই অর্থ কোন্ খাতে ব্যবহার করা হয়। তিনি তখনই চাঁদা প্রদান করেন এবং বলেন, ভবিষ্যতে জামা'তের সকল চাঁদার খাতে আমি উৎসাহ্ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিব।

মোটকথা আমরা দেখি, এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এমন মানুষ দিচ্ছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী থাকে। তারা নতুন আহমদী হলেও আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্প সময়ের ভেতরই আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের এক গভীর প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটি চিন্তার বিষয় তাদের জন্য, যারা সচ্ছল ও সঙ্গতিশীল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছেন, তারা সম্পদশালী দেশে বসবাস করে, অথচ তাদের কুরবানী একেবারেই তুচ্ছ হয়ে থাকে। যদিও এখানেও অনেকেই এমন আছে, যারা অসাধারণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক সম্পদশালী বা ধনী মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে, যাদের এদিকে দৃষ্টি খুবই কম। এদিকে তাদের মনোযোগ দেয়া উচিত।

জানুয়ারির প্রথম শুক্রবারে যেভাবে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করার রীতি রয়েছে, সে রীতি অনুযায়ী বহু ঘটনার মধ্য থেকে মাত্র এ কয়েকটি ঘটনাই আপনাদেরকে শোনানোর জন্য আমি বেছে নিয়েছি। চাঁদার গুরুত্ব তুলে ধরার পর এখন আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা দিচ্ছি আর গত বছর খোদার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে, তাও উল্লেখ করছি যে, আদায় কেমন ছিল।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের বছরের সমাপ্তি ঘটে ৩১ ডিসেম্বরে। ৫৯তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে। খোদার অপার কৃপায় পৃথিবীর জামা'তগুলো থেকে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে জামা'ত ৮০,২০,০০০ (আশি লক্ষ বিশ হাজার) পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর জামা'ত ১১,২৯,০০০ পাউন্ড বেশি চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বছরও পাকিস্তান পৃথিবীর জামা'তগুলোর মাঝে মোটের ওপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে যারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে, তাদের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানা তালিকার শীর্ষে। এরপর জার্মানি ও পাকিস্তানের পর রয়েছে কানাডা।

আফ্রিকান দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কুরবানী যেসব দেশ করেছে, তাদের মাঝে রয়েছে মালি, বুরকিনাফাঁসো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিয়েরালিওন এবং বেনিন।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বাইরে বহির্বিশ্বের প্রথম দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের আরেকটি দেশ আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। এরপর আসবে বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানী, ত্রিনিদাদ, বেলজিয়াম এবং কানাডা। যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে পিছিয়ে আছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে ১৩,৪০,০০০ চাঁদাদাতা অংশ গ্রহণ করেছে। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাজ্য ছাড়াও আফ্রিকার গিনিকোনাকরি, ক্যামেরুন, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, বেনিন, নাইজার, কঙ্গো কিনশাসা, বুরকিনাফাঁসো এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

নাইজেরিয়া এ বছর পুরোপুরি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি। কেননা সংখ্যার দিক থেকে তাদের চাঁদাদাতার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। নাইজেরিয়ার এবং আরো দু'একটি দেশের সংখ্যা যদি গত বছরের মতোও থাকত, বরং শুধু নাইজেরিয়ার সংখ্যাই যদি বৃদ্ধি পেত, তাহলে ১৩,৪০,০০০ এর পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী ১৪,০০,০০০ এ উপনীত হত। এর অর্থ হল, সেখানে অনেক আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে বা সঠিক রিপোর্ট আসে নি বা রিপোর্ট নেয়া হয় নি। হয়তো সঠিকভাবে তাদের কাছে যাওয়াই হয় নি বা approach করা হয় নি। সচরাচর সেক্রেটারীদেরই আলসেমি হয়ে থাকে। জামা'তের সদস্যদের আন্তরিকতার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে কোন ঘাটতি নেই, তা আফ্রিকা হোক বা অন্য কোন দেশই হোক না কেন। রাবওয়া থেকে এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, মহল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব তার কাছে আসেন আর বলেন, আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদা করেন নি, আর চাঁদাও দেন নি। তিনি বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে? আমি রীতিমত চাঁদা দেই। তখন তিনি বলেন, এ বছর আমাদের সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ এত আলস্য দেখিয়েছে যে, মহল্লার কারোই ওয়াদা নেয়া হয় নি আর সঠিকভাবে আদায়ও হয় নি। এটি থেকে বুঝা গেল, সেক্রেটারীদের আলস্যের কারণেই অনেক সময় মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। নাইজেরিয়াতেও আমার মনে হয় এমনটিই হয়েছে। এছাড়া আমেরিকাতেও সংখ্যা কমেছে। অথচ সেখানে চাঁদা দাতার সংখ্যা কমে যাওয়ার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। আর নাইজেরিয়াতেও এর কোন কারণ নেই। সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তবে যেমনটি আমি বলেছি, মাথাপিছু কুরবানীর মানে আমেরিকা অনেক উন্নতি করেছে, মাশাআল্লাহ্। আর তারা রয়েছে প্রথম স্থানে। অনুরূপভাবে, সেসব দেশও চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন, যাদের গত বছরের চেয়ে সংখ্যা কমে গেছে এবং নিজেদের দুর্বলতা (দূর করার) প্রতি দৃষ্টি দিন। সাধারণ মানুষের ভেতর দুর্বলতা নেই, ত্রুটি রয়েছে কর্মীদের মাঝে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের একটি খাত হল, সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার খাত। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর। এরপর রাবওয়া, তারপর রয়েছে করাচী। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ক্রমানুযায়ী রয়েছে ইসলামাবাদ, গুজরাঁওয়ালা, গুজরাত, মুলতান, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, পেশওয়ার, মিরপুর খাস, উকাড়া এবং ডেরাগাজী খান।

আতফাল বিভাগ অর্থাৎ শিশুদের আর্থিক কুরবানীতে লাহোর প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে রাবওয়া, করাচী, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাঁওয়ালা, গুজরাত, হায়দারাবাদ, ডেরাগাজী খান, কোটলী, আযাদ কাশ্মীর, মিরপুর খাস, মুলতান এবং ভাওয়াল নগর।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যান্ডের ১০টি বড় জামা'ত হল উস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্মিংহাম সাউথ। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পাটনি, রেইঞ্জ পার্ক, ব্র্যাডফোর্ড নর্থ, নিউ মল্ডেন, গ্লাসগো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং জিলিংহাম।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে অঞ্চলগুলোর মাঝে লন্ডন বি প্রথম স্থানে, এরপর লন্ডন এ, তারপর মিডল্যান্ডস্, নর্থ ইস্ট, এরপর সাউথ।

চাঁদা সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় জামা'তের এমারতের মাঝে হ্যামবুর্গ প্রথম স্থানে রয়েছে, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, মোরফিল্ডন ওয়ালড্রোফ, ডিসেন্ট বাখ। আর মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে রোয়েডারমার্ক, নোয়েস, ফ্রিডবার্গ, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, হানাও, কোলন, কোবলেনয্, লাঙ্গন এবং মেহেদীয়াবাদ।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে সিলিকন ভ্যালী, এরপর যথাক্রমে সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভারস্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস ইষ্ট, ডালাস, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং লাওরেল।

কানাডার জামা'তগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে ক্যালগেরী, এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, ভন, ভ্যানকুভার ও মিসিসাগা।

সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি বড় জামা'তের মাঝে ডারহাম প্রথম স্থানে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে মিলটন ইষ্ট, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং উইন্ডসর। এরপর লয়েডমিনিস্টার, অটোয়া ওয়েস্ট, অটোয়া ইস্ট, বেরী এরপর রয়েছে রিজাইনা।

আতফাল বিভাগে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা'ত হল,যথাক্রমে ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং লয়েড মিনিস্টার।

অঞ্চলের দিক থেকে ক্যালগেরী প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে পিসভিলেজ, ব্রম্পটন, ভন এবং রয়েস্টান।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমটি হল, কেরালা, দ্বিতীয়ত জম্মু-কাশ্মীর, তৃতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে কেরোলায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে, তারপর ক্যালিকাট, হায়দারাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কান্নোর টাউন, কোলকাতা, বেঙ্গালোর, সেলোর এবং পেঙ্গাডী।

অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হল, যথাক্রমে ক্যাসেল হিল, ব্রিজবেন লুগান, মার্সডেনপার্ক, বারবিক, প্যাজিথ, এডিলেড সাউথ, প্লামটন, ক্যানবেরা, লাঙ্গওয়ারেন, এডিলেড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধন এবং জনসম্পদে অশেষ ও অঢেল বরকত দিন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন যাতে ভবিষ্যতে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে আর যেসব ঘাটতি রয়েছে, তা যেন পুরণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অঙ্ক তো বৃদ্ধি পেয়েই থাকে, কিন্তু যৎসামান্য অর্থ দিয়ে হলেও সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক।

নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার, যিনি সাহেবযাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৩ ডিসেম্বর ৭৯ বছর বয়সে তিনি কানাডায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৩৫ সনে জুন মাসে ভাগলপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী আবদুল বাকী সাহেব এবং তার মা সুফিয়া খাতুন সাহেবা। তার পিতা দীর্ঘদিন কুনরীতে অবস্থিত জামা'তের ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন কুনরী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

হযরত আলী আহমদ সাহেব (রা.) ছিলেন তার দাদা, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, সাহাবী ছিলেন। তার বয়আতের ঘটনা আমাতুন নূর সাহেবা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি, তিনি যখন কাদিয়ান আসেন, তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কাদিয়ান যাওয়ার পর পথে অমৃতসর রেল স্টেশনে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। উত্তরে তিনি মৌলভী সাহেবকে বলেন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পর আমার মা আমাকে গবেষণার জন্য কাদিয়ান পাঠিয়েছেন। আপনার এই আচরণের মাধ্যমে মির্যা সাহেবের সত্যতা আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। আপনার মত এত বড় মৌলভী কোন মিথ্যা নবীর দাবিকারকের জন্য এত সময় কেন নষ্ট করবে? এভাবে আপনার ঘোরাফেরা করা আর সময় নষ্ট করা থেকে বুঝা যায়, মির্যা সাহেব সত্য।

১৯৬৪ সনের ৬ জানুয়ারি আসমা সাহেবার বিয়ে হয়।যেমনটি পূর্বেই আমি বলেছি, তিনি মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মির্যা খলীল আহমদ সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুত্র আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৌহিত্র ছিলেন। সাহেবযাদী আমাতুল হাই সাহেবার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবা কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র জেনারেল সেক্রেটারী আর সেক্রেটারী যিয়াফত, এছাড়া আন্তর্জাতিক তবলীগি পরিকল্পনা কমিটির সদস্যা এবং স্থানীয় লাজনারও কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

আসমা তাহেরা সাহেবার পিতা ১৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন। এরপর মা তার সাথেই ছিলেন। আসমা তাহেরা সাহেবা আমার মামী ছিলেন, তাই আমিও তার সম্পর্কে জানি। শ্বশুরালয়ে তার ননদদের এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থতার সময় আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। সম্প্রতি তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন। তার রোগের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি যখন তার কাছে যাই এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন তার পক্ষে নড়াচড়া করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তখনো তার বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! তিনি বলেন, আমার কাপড় বের করে রাখ, প্রস্তুতি নাও, তিনি (আমার কথা বলেন,) হয়ত আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। 'সাক্ষাতের জন্য আসুন' আমাকে এই বার্তা দেয়ার পরিবর্তে তিনি আশা করছিলেন, হয়ত আমিই তাকে ডেকে পাঠাব। যাহোক, আমি তার সাথে দেখা করে এসেছি। এ কারণে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, বোনের এক মেয়েকে তিনি পেলেছেন। পাঁচ বছর বয়সেই সে তার কাছে এসেছিল। তিনি বলেন, আমাকে আপন সন্তানের মত লালন-পালন করেছেন আর বিয়ের সময়েও আমার বিয়ের সকল আয়োজন তিনিই করেছেন। আমার তরবীয়ত এবং শিক্ষায় কোন ঘাটতি তিনি রাখেন নি। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে আমাকে বলতেন, দোয়া কর, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। দোয়ার প্রতি তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। বাচ্চাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, তাদের তরবীয়তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। তিনি বলতেন, সন্তানদেরকে মসজিদে নিয়ে যাবে। কেননা, তাদেরকে যদি মসজিদে ব্যস্ত রাখ, তাহলে বাচ্চারা কখনোই উচ্ছন্নে যাবে না এবং নষ্ট হবে না। সব সময় জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। এই মেয়ে বলছে, আমাকে ওসীয়্যত করার জন্যেও নসীহত করেছেন। আর সব সময় এই নসীহত করতেন যে, জামা'তের সাথে সর্বাবস্থায় সম্পৃক্ত থাকবে। কাজের লোকদের সাথেও কোমল ব্যবহার করতেন। ঘরে কাজের মেয়ে ছিল, তার সম্পর্কে তার এই পালিতা কন্যাকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তার যত্ন নিবে আর আমি তাকে বাড়িতে যে কোয়ার্টার দিয়েছি, সেখান থেকে তাকে বের করে দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন এবং নিজ করুণায় সিক্ত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, জনাব চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের। ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে লাহোরে তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। চৌধুরী হামীদ

> এটি সেই জামা'ত, যা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামা'ত। এটি সেই জামা'ত' যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামা'ত, যার ওপর সারা বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামা'ত গত প্রায় ১২৮ বছর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার মানসে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওঊদ (আ.) এ জামা'তকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়-স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন।

নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব-এর দাদা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার নানা ছিলেন চৌধুরী ফতেহ্ মোহাম্মদ সিয়াল সাহেব(রা.)। তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব দীর্ঘদিন করাচি জামা'তের আমীর ছিলেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তার জেঠা আর একই সাথে শ্বশুরও ছিলেন। ১৯৬৪ সনে চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের বিয়ে হয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের কন্যা আমাতুল হাই সাহেবার সাথে। তার সন্তানরা হলেন, মোস্তফা নাসরুল্লাহ্ খান এবং ইব্রাহীম নাসরুল্লাহ্ খান, যিনি ১৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন আর আয়শা নাসরুল্লাহ্ হলেন তার একমাত্র কন্যা। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ সাহেবের সাথে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের যে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, ইতিপূর্বে ডাক্তার ইজাজুল হক সাহেবের সাথেও তার বিয়ে হয়। সেই ঘরে তার দুই ছেলে ছিল, মুহাম্মদ ফযল হক এবং আহমদ নাসরুল্লাহ্। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সনে আহমদ নাসরুল্লাহ্‌কে লাহোরে শহীদ করা হয়েছিল। এখন তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানদেরকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে আপন সন্তানের মত কাছে রেখেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৫ সনে তাকে জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীর নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ৩৪ বছর জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২০০৯ সন থেকেই তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। আমার কথায় অর্থাৎ,'আপনি দেখুন! কাজ করতে পারবেন কি-না' তিনি বলেন, ঠিক আছে! আমি অপারগ। অপারগ এই অর্থে যে, স্বাস্থ্য ভালো নয়, এমারতের কাজ অনেক ব্যাপক। এরপর শেখ মুনীর সাহেব সেখানে নতুন আমীর নিযুক্ত হন, যিনি ২০১০ সনে শাহাদত বরণ করেন। ২০০৮ বা প্রায় ২০০৯ সন পর্যন্ত তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৪ সনের বৈরী পরিস্থিতিতে তিনি যথারীতি আমীরের পদে না থাকলেও খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার ওপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। আর তিনি তা সুচারু রূপে পালন করতেন। ১৯৭৪ সনে হাইকোর্টে যখন বিচারপতি সামদানীর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তখন তাতেও তার সেবার খতিয়ান ছিল অনেক দীর্ঘ। ১৯৮৪ সনের পরীক্ষার যুগে লাহোরের কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালতে যে মামলাটি চলছিল, সেখানেও তিনি অনেক সেবা করেছেন। তিনি আরেকটি মহা সম্মানও লাভ করেছেন আর তা হল, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরতের সময় তিনি রাবওয়া থেকে লন্ডন পর্যন্ত হুযূরের সাথেই ছিলেন। বরং আমার জানা মতে, রাবওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত তিনিই গাড়ি চালিয়েছেন। তার এমারত কালে লাহোরের দারুয্ যিক্‌র সম্প্রসারিত হয়েছে আর এখনো তা অব্যাহত আছে। যাহোক, সেই যুগে অনেক কাজ হয়েছে। তার এমারত কালে লাহোরে অনেকগুলো নতুন নতুন আর সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং আহমদীয়া জামা'ত লাহোর উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করেছে। গত ৩২ বছর থেকে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। ১৯৮৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ড হিজরতের সময় যেমনটি আমি বলেছি, তার সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান তিনি লাভ করেছেন। ইয়ান এ্যাডামসনের (Iain Adamson) যে বই আছে, তাতেও তিনি তার কথা উল্লেখ করেছেন।

লাহোরের সেক্রেটারী উমুরে আমা চৌধুরী মনোয়ার সাহেব লিখেন, হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব তার সহকর্মীদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন, তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনের প্রতিও অনেক দৃষ্টি রাখতেন। কোন পরামর্শ চাওয়া হলে অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন, ৯ বছর আমি লাহোরের জেলা কায়েদ হিসেবে কাজ করেছি, কিন্তু কখনোই তিনি কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে অনেক বেশি সহযোগিতা করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার পাঁচটি ইজতেমা লাহোরের বাহিরে করানোর সুযোগ হয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের বস্তুনিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতেন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব খুব ভালো একজন ব্যবস্থাপকও ছিলেন আর যথাসময়ে এবং যথাস্থানে তিনি কাজ সম্পন্ন করতেন। সব জামা'ত সফর করতেন, হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমেলার সদস্যদেরকে তিনি তার বন্ধু এবং বাহু জ্ঞান করতেন।

হাকীম তারেক সাহেব লিখেন, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে খিলাফতের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। জামা'তের কর্মী এবং খাদেমদের সাথে খুবই নম্র এবং হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাদেরকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। প্রথমে আমার নাযেরে আলা থাকা কালীন সময়ে আমার সাথে যতদিন তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন, সেখানেও কেন্দ্রের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা এবং আনুগত্যের সাথে কাজ করেছেন। আমার নাযেরে আলা থাকা অবস্থায়ও তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন এবং খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও যতদিন তিনি লাহোরের আমীর ছিলেন, পূর্ণ সহযোগিতার চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন। তার মাঝে গভীর আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল।

লাহোর জেলার নায়েব আমীর কর্ণেল নঈম সিদ্দিকী সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘটনা বলা শুরু করলে বলতেই থাকতেন। কর্ণেল নঈম সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন, একবার তিনি ভাওয়ালপুরে কোন কাজে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বার্তা পান যে, রাবওয়ায় পৌঁছুন। ভাওয়ালপুর পৌঁছে গিয়েছিলেন,কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি অবিলম্বে রাবওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাতারাতি সফর করে ফজরের পূর্বেই রাবওয়া পৌঁছে যান। তিনি বলেন, আমি বাহিরে পায়চারী করতে থাকি আর যখন দেখি, এটি তাহাজ্জুদের সময় বা তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়, তখন তিনি হুযূরকে পয়গাম পাঠান যে, আমি পৌঁছে গিয়ে আপনার সকাসে উপস্থিত আছি।

দরিদ্রদের নামে তিনি বৃত্তি চালু করেছিলেন। কেবল নিজের পক্ষ থেকেই নয়, বরং তার স্ত্রী, তার পিতা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের পক্ষ থেকেও বৃত্তি চালু করেছিলেন। যখনই কারো আবেদন আসত, তিনি অগ্রগামী করে বলতেন, আমার খাত বা স্ত্রীর হিসাব বা অন্য কোন হিসাব থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হোক। এটিও তিনি সঠিক লিখেছেন যে, হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের ইতিহাস ছিলেন।

যাহোক, খোদার পক্ষ থেকে তিনি নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত ছিলেন আর এর সঠিক ব্যবহারও করতেন।

ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী নাসির শামস সাহেব লিখেন। (যেমনটি আমি বলেছি, তিনি ৩২ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।) চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর ১৯৮৬ সনে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছর ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি খুবই সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, স্নেহশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং হাসি-খুশী মানুষ ছিলেন। তার পরিচিতির গন্ডি ছিল অনেক ব্যাপক আর এই সম্পর্ককে সব সময় জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ, জামা'তের সেবক, খলীফাগণের সুলতানে নাসীর, খিলাফতের জন্য পরম আত্মাভিমানী এবং বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন মিটিং-এ যোগদান করতেন, সঠিক মতামত ব্যক্ত করতেন এবং বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন বা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা রাখতেন। খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতায় কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। মির্যা নাদীম সাহেব লিখেন, তিনি নিজে আমাকে শুনিয়েছেন, ১৯৭৫ সনে তাকে যখন লাহোরের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তিনি খুবই ভয় এবং শঙ্কা নিয়ে রাবওয়ায় হযরত খলীফা সালেস (রাহে.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের অনুরোধ পাঠান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে আর কীভাবে এলেন? তিনি বলেন, আমি এই পদের যোগ্য নই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, খাবারের সময় হচ্ছে, প্রথমে খাবার খাও। চৌধুরী সাহেব তখনো তার কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তিনি বলেন, এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, যুগ খলীফা তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন আর আল্লাহ্‌র খলীফা ভালো জানেন। তিনি বলেন, এরপর কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় আর কখনো আমি বিচলিত হই নি। খিলাফতের দোয়ার কল্যাণে আমার সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততিকেও বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪, পৃ: ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

[১ পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতায় সম্পাদকীয়'র অবশিষ্টাংশ]

দরূদ শরীফ কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই আরশকে উদ্বেলিত-স্পন্দিত করা, যা হতে অসংখ্য আলোক ধারা উৎসারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশী যে, তার জন্য অবশ্য করণীয় হলো অজস্র সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করা, যেন সেই কল্যাণধারা উদ্বেলিত হয়"। [আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩, পৃ.-৭]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন: মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ 'চাকর', আর চাকর-এর কাজ হলো মনিব যে নির্দেশই দেয় তা পালন করা। অনুরূপভাবে, তোমরা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর আশিস পেতে চাও তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, তাঁর (সা.) অনুগত দাস হয়ে যাওয়া।

রাসূল করীম (সা.)-এর বান্দা বা চাকর গণ্য হওয়ার জন্য যা আবশ্যক, তা হলো তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করা আর তাঁর (সা.) কোন একটি নির্দেশেরও অমান্য না করা আর সমস্ত আদেশ-নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।" [বদর পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, পৃ. ১০৯]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন: মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ 'চাকর', আর চাকর-এর কাজ হলো মনিব যে নির্দেশই দেয় তা পালন করা। অনুরূপভাবে, তোমরা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর আশিস পেতে চাও তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, তাঁর (সা.) অনুগত দাস হয়ে যাওয়া।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– **কুল ইয়াই'বাদি-ইয়াল্লাযিনা আসরাফু আ'লা আনফুসিহিম**। (আল যুমার, ৩৯:৫৪)

অর্থাৎ–তুমি বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সব পাপ অবশ্যই ক্ষমা করতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

এখানে 'বান্দা' বলতে 'চাকর' বোঝানো হয়েছে (সাধারণ) সৃষ্টি নয়। রাসূল করীম (সা.)-এর বান্দা বা চাকর গণ্য হওয়ার জন্য যা আবশ্যক, তা হলো তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করা আর তাঁর (সা.) কোন একটি নির্দেশেরও অমান্য না করা আর সমস্ত আদেশ-নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।" [বদর পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, পৃ. ১০৯]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি আবেগময় দরূদ এভাবেও পাঠ করতেন:...

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লাইহি ওয়া আলিহি বি আ'দাদি হাম্মিহি ওয়া গাম্মিহি ওয়া হুযনিহী লি হাযিহিল উম্মাতি ওয়া আনযিল আ'লাইহি আনওয়ারা রাহমাতিকা ইলাল আবাদি"।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ্! দরূদ ও সালাম আর কল্যাণরাজিতে সিক্ত মহানবী (সা.)-কে, তাঁর (সা.) অনুসারীদের এতো বেশী পরিমাণে কৃপা ও আশিস দান করো যতটা দুঃখ-বেদনাপূর্ণ উদ্বেগ তাঁর হৃদয়ে এই উম্মতের জন্য বিরাজ করতো, আর তাঁর (সা.) প্রতি তোমার রহমতের জ্যোতি সর্বক্ষণ অবতীর্ণ করতে থাকো। [বারাকাতুদ্ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-১১]

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দরূদ শরীফের আশিস থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন আর জ্যোতির্ময় সেই আলোকধারায় যথাশীঘ্র জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

জুমুআর খুতবা

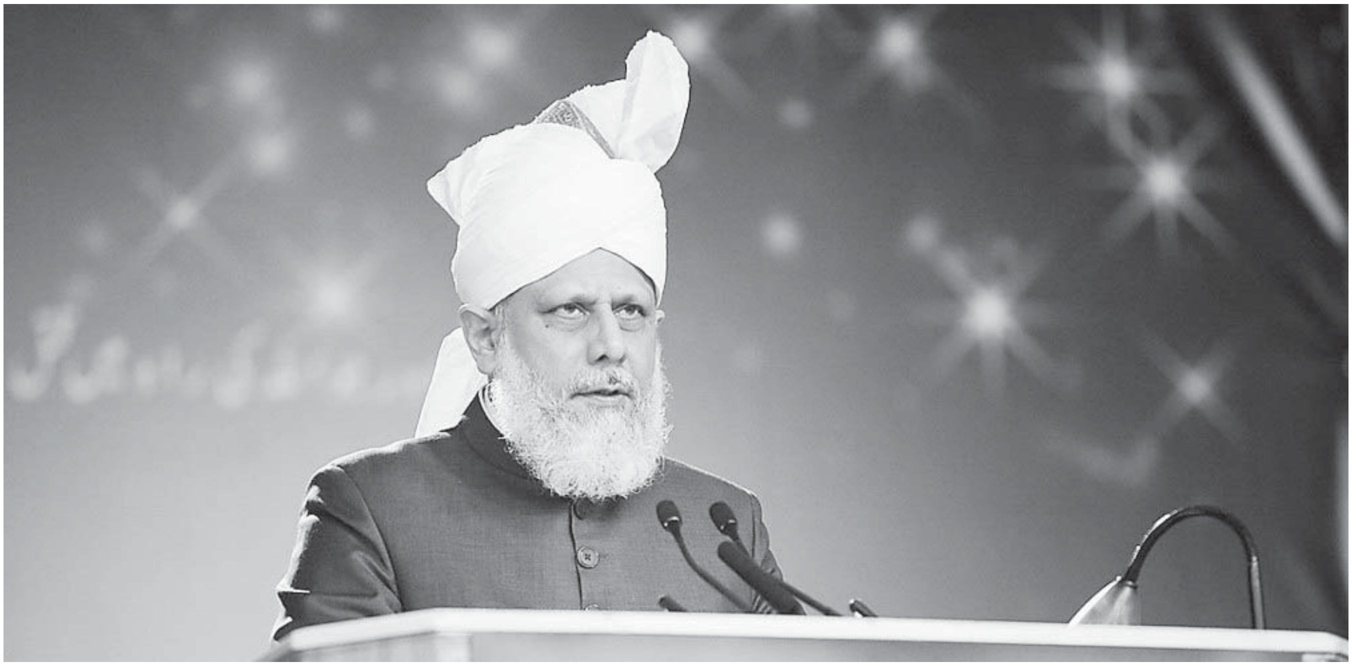

প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন–

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞

(সূরা আন্ নাহাল: ১২৬)

এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমার প্রভুর পথ পানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মধ্যমে আহ্বান কর। আর তাদের সাথে যুক্তিতর্কে সেই পন্থা অবলম্বন কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাঁর পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে তাকে সর্বাধিক জানেন। আর হিদায়াত-প্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের জামা'ত তাদের মজলিসে শূরায় এই প্রস্তাবটি রেখেছে এবং এ বিষয়ে অনেক ভালো আলোচনাও করেছে আর সব জামা'তের মজলিসে শূরাই তবলীগের কাজ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী স্ব-স্ব দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজকে কীভাবে ব্যাপকতা দেয়া যায় অথবা উত্তম ভিত্তির ওপর এটিকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে বিষয়ে নিজেদের কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে? যুক্তরাজ্যের জামা'তও এ বছর তাদের মজলিসে শূরার আলোচ্যসূচিতেএ প্রস্তাবটি রেখেছিল। মজলিসে শূরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার পর স্বীয় কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে এবং আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে।

কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, তবলীগ-সংক্রান্ত এই পরিকল্পনাই

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো, জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে, আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। বর্তমান যুগে এ অজুহাতও ধোপে টিকবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সুন্দর যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে, যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে।

হোক বা অন্য কোন কাজের পরিকল্পনাই হোক না কেন, মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা করে, তখন শূরার সদস্যদের বিভিন্ন মতামত সামনে আসে আর তারা একটি মতে উপনীত হয় বা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি একটি মতৈক্যে পৌঁছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর অনুমোদন যখন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা উজাড় করে দিয়ে এর ওপর আমল করা এবং করানো মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব।

অতএব তবলীগের কাজে গতিসঞ্চার বা তবলীগি কর্মকাণ্ডকে আরো বিস্তৃত করার জন্য এই যে প্রস্তাব যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আলোচিত হয়েছে ও এমর্মে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বা পৃথিবীর যে দেশেই এটি নিয়ে পরামর্শ হয়েছে এবং যুগ-খলীফার কাছ থেকে অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য জামা'তসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা ও করানোর ক্ষেত্রে শূরার সকল সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তার এখন সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে করবেন না যে, এ প্রস্তাবটি যেহেতু তবলীগ সংক্রান্ত, তাই শুধু সেক্রেটারী তবলীগের ওপরই এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে অথবা অন্য কোন বিভাগ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব হলে কেবল সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই এর (বাস্তবায়নের) জন্য দায়ি (তা মনে করবেন না)। নিঃসন্দেহে এটিকে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই দায়ী হবেন, কিন্তু বিশেষ করে তবলীগ এবং তরবিয়ত বিভাগ এমন যে, এ ক্ষেত্রে জামা'তের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীর অংশগ্রহণ করা এবং নিজের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

এখন যেহেতু আমি তবলীগের প্রেক্ষাপটে কথা বলতে চাই, তাই এই প্রেক্ষিতে আমি সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, তারা যেন স্ব স্ব জামা'তে এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সেক্রেটারী তবলীগের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। নিজেরা এর অংশ হয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। কোন ব্যক্তি, সে যে পদেই থাকুন না কেন, কোন না কোনভাবে তারা তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। আর যদি ওহদাদার বা পদধারীরা অংশ নেয়, তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনেও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে, আর অনেক আহমদী এমন থাকবে, যারা না বলতেই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রচার কাজে নিজ থেকেই ভূমিকা রাখতে পারবে। কোন কোন বিভাগের সেক্রেটারীদের এমনিতেও তত বেশি কাজ হয় না। তারাও সময় দিতে পারেন। শুধু নিয়্যত এবং সংকল্প ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। যাহোক, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগের কাজ হলো, যে কর্মপন্থাই নির্ধারণ করা হয়েছে তা সব স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগের কাছে পৌঁছানো। আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করুন যে, জামা'তের এই কর্মপরিকল্পনার যে দিকগুলো (সাধারণ) সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যে অংশ প্রশাসনিক নয়, বরং সাধারণ সদস্যের সাথে সম্পর্কিত, তা যেন প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, তাতে খোদা তা'লা আমাদের যে পথনির্দেশ দিয়েছেন তা বুঝার চেষ্টা করুন আর সে অনুসারে প্রত্যেক সেক্রেটারী তবলীগ, প্রত্যেক পদধারী ও বিশেষ দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্ বা প্রচারকারীদের কাজ করা উচিত। আমি দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্‌র উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্য করেছি কেননা তারা স্বয়ং নিজেদের নাম প্রস্তাব করেছেন যে, জামা'তের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বেশি সময় ব্যয় করব। তারা যদি সময় দেন আর জ্ঞানও থাকে অথচ সেসব কথার প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে, যা খোদা তা'লা বলেছেন, তাহলে এতে সেই আশিস ও কল্যাণ লাভ হতে পারে না এবং সেই উত্তম ফলাফল বের করা যাবে না, যা প্রকাশ করা সম্ভব হতো।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো حِكْمَةِ অর্থাৎ প্রজ্ঞা। এরপর রয়েছে مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ অর্থাৎ সুন্দরভাবে বোঝানো। এরপর বলা হয়েছে, যুক্তিতর্কের সময় এমন প্রমাণাদি উপস্থাপন কর, যা সর্বোত্তম। অধুনা নামধারী আলেম এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলো নিজেদের উন্মাদনা এবং প্রজ্ঞা ও যুক্তিশূন্য

আর প্রমাণবিহীন কথার মাধ্যমে ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে যে, অমুসলিম বিশ্ব মনে করে, ইসলাম নাঊযুবিল্লাহ্ একটি প্রজ্ঞাশূন্য ও অবাস্তব ধর্ম এবং নির্বোধ ও অজ্ঞদের ধর্ম, আর চরমপন্থাই হলো এ ধর্মের একমাত্র শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশ বা বাণী অনুসারে তবলীগ করা এবং তবলীগের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সব আহমদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অতএব এ দায়িত্বকে সর্বপ্রথম সর্বস্তরের ওহদাদার বা পদাধিকারীদের বুঝতে হবে। গত দু'এক বছরে এসব চরমপন্থি এবং কতিপয় আলেমের কর্মকাণ্ড ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে আর প্রচারমাধ্যমও এসব কথাকে এত ফলাও করে প্রচার করেছে যে,সম্প্রতি একটি জরিপ চালানো হয় যাতে ইসলাম চরমপন্থি ও নির্দয় ধর্ম কি-না আর মুসলমানরা অপছন্দনীয় কি-না, সেসম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সংখ্যারিষ্ঠের উত্তর এটিই ছিল যে, ইসলাম একটি চরমপন্থি ধর্ম আর মুসলমানরা ঘৃণ্য মানুষ, আমরা চাই না মুসলমানরা আমাদের দেশে বসবাস করুক, এরা দেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এ সম্পর্কে যে জরিপ হয়েছিল, তার ফলাফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি মুসলমানদেরকে ভালো মানুষ মনে করত। অতএব এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মাঝে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো উচিত যে, কতটা পরিশ্রমের সাথে খোদা তা'লার বর্ণিত পন্থায় আমাদের তবলীগ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হলো, হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? হিকমত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ আমাদের জানা থাকা আবশ্যক, যেন তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা এসব কথা দৃষ্টিপটে রাখতে পারি।

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে, আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। বর্তমান যুগে এ অজুহাতও ধোপে টিকবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সুন্দর যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে, যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে। এছাড়া প্রশ্নোত্তরের আকারে অডিও ভিডিও তথ্যাদি রয়েছে। সেই সাথে ওয়েব সাইটসমূহও রয়েছে। তবলীগ করার সময় অনেক অ-আহমদী অথবা অমুসলিম এমন আছে যারা বলে বসে, আমাদের কাছে এখন দীর্ঘ বিতর্কের সময় নেই, এমন লোকদেরকে তখন প্যাম্ফলেটও দেয়া যেতে পারে আর ওয়েব সাইটের ঠিকানাও দেয়া যেতে পারে। অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা আগ্রহ রাখে, কিন্তু তাদের কাছে তাৎক্ষণিক সময় থাকে না, তারা পরে তথ্য সংগ্রহ করে। অনেকে নিজেরাই আমাকে জানিয়েছে যে, তারা এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। অতএব প্রথমত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, যেন যাদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে, তাদের সাথে তাদের মান অনুযায়ী কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত আমাদের বইপুস্তক এবং ওয়েব সাইটে নির্দিষ্ট কোন স্থানে এসব জ্ঞানগত উত্তর ও তথ্য রয়েছে, এটিও জানা থাকা উচিত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এবং নাস্তিকদের সাথে আলোচনার সময় তাদের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিপ্রমাণ অনুসারে আমাদের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

এরপর হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, দৃঢ়ও পাকা কথা (আকরাবুল মওয়ারেদ)। এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন হওয়া উচিত যা নিজেই জোরালো এবং অকাট্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে প্রমাণের জন্য আমাদের আরো যুক্তিপ্রমাণের মুখাপেক্ষী হতে হবে আর এরপর সেগুলোকেও পুনরায় প্রমাণ করতে হবে। অতএব দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপত্তি অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদির ভিত্তিতে তা খণ্ডনের চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া তবলীগ বিভাগের আরেকটি কাজ হলো, পরিস্থিতি অনুসারে এমন সব আপত্তি এবং এর খণ্ডনমূলক প্রমাণাদি এক জায়গায় একত্রিত করে জামা'তসমূহে সরবরাহ করা, যেন বিভিন্ন আপত্তির জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক খণ্ডন অধিকাংশ মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়।

হিকমত শব্দের অপর একটি অর্থ হলো আদল বা ইনসাফ। বিতর্কের সময় এমন আপত্তি করা উচিত নয় যা উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই বর্তাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত ও সুশিক্ষা এবং বইপুস্তক আর খলীফাদের বইপুস্তকের কারণে সচরাচর এমনটি ঘটে না। কিন্তু অপরাপর সাধারণ মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মাঝে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তায়। অনেক বড় বড় মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করে; কিন্তু তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তাতে পারে। অতএব এদিক থেকেও তবলীগ বিভাগের উচিত এসব আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনসব আপত্তি করা হয় যা অন্যদের বিরুদ্ধেও যায় আর তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধেও আপতিত হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তখন থেকেই তাদের এসব আপত্তি খণ্ডন করে আসছেন আর তাদেরই বইপুস্তক থেকে তা দিয়েছেন। বিধর্মী ও মুসলমানদেরও তাদেরই স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে বলেছেন যে, তোমরা যে আপত্তি করছ এটি কোন আপত্তি নয়, কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন আপত্তি পূর্বেও করা হয়েছিল।

আমি যেমনটি বলেছি, তবলীগ বিভাগের উচিত, কিছু এমন আপত্তি ছোট লিফলেটের আকারে ছাপিয়ে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। অধিকাংশ লোককে যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত করতে হয়, তাহলে এ বিভাগের এতটা পরিশ্রম করতেই হবে এবং খরচও করতে হবে।

অনুরূপভাবে, হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। অতএব তবলীগের ক্ষেত্রে কোমলতা বা নমনীয়তা এবং বিবেকবুদ্ধি খাটানো একান্ত আবশ্যক। রাগ ও উগ্রতার সাথে কথা

> যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তায়। অনেক বড় বড় মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করে; কিন্তু তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তাতে পারে। অতএব এদিক থেকেও তবলীগ বিভাগের উচিত এসব আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা।

বললে অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আর তারা মনে করে, কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই, তাই উগ্রতার সাথে উত্তর দেয়া হচ্ছে। রাগ যে দেখায় বা উগ্রতা যে প্রদর্শন করে, তার সাথেও কোমল ভাষায় কথা বলা উচিত। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদেরকে নামধারী আলেমদের উগ্রতা ও চরমপন্থাই আপত্তি করার রশদ জুগিয়েছে, নতুবা শান্তভাবে কথা বলা হলে এমন অনেক আপত্তি আছে যা এমনিতেই দূর হয়ে যায়।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো নবুয়্যত। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ক করা এবং যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুক্তিপ্রমাণ ও এর শিক্ষা অনুসারে আমাদের তবলীগ করা উচিত। আমি দেখেছি, ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী বা আপত্তিকারীদের সামনে কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে যখন কথা বলা হয়, তখন তাদের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়ে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো অজ্ঞতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অতএব এমনভাবে কথা বলা উচিত যা অন্যদের জন্য সহজবোধ্য হয় এবং তার অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, মানুষের বোধবুদ্ধি অনুসারে তাদের সাথে কথা বল। (কনযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম মিন কিসমিল আক্বওয়াল, পৃ: ১০৫, হাদীস: ২৯৪৬৮)

এছাড়া এর আরেকটি অর্থ হলো সত্য-সম্মত ও যথার্থ কথা বলা। সর্বদা সত্য এবং বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা উচিত। অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সত্য এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত কথা বলা উচিত নয়। সত্যতা ও বাস্তবতা পরিপন্থি কথা মন্দ প্রভাব ফেলে। কেননা কোন না কোন সময় সত্য প্রকাশ পেয়েই যায়। তাই সর্বদা সত্য ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত।

এছাড়া স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়।অর্থাৎ কোন যুক্তি-প্রমাণে বিরোধীর যদি রাগান্বিত বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তবলীগি আলোচনার পরিবর্তে ঝগড়াবিবাদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এমন কথা বলা থেকে বিরত থেকে এরূপ কথা বলা ও প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যা যথাযথও হবে আর একই সাথে অন্যের রুচিসম্মতও হবে এবং দূরত্ব বাড়ানোর পরিবর্তে কাছে টানার কারণ হবে। এক ব্যক্তি বৈঠকে কোন একটি কথা বলে আর অন্য কোন ব্যক্তি তা শুনে এবং তার ওপর এর সুপ্রভাব পড়ে। কিন্তু তখন কথা বলার পর এটি ভেবে চুপ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যে, কখনো সুযোগ পেলে পুনরায় এই সভায় কথা বলা যাবে, সে ঐ ব্যক্তির পিছনে পড়ে যায় এবং বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বা তাকে মানানোর চেষ্টা করে যে, আজকে মানিয়েই ছাড়ব, তোমার মানতেই হবে। যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায় এবংকাছে আসা ব্যক্তিও দূরে সরে পড়ে আর প্রথম কথার ইতিবাচক যে প্রভাব পড়েছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলা তবলীগের জন্য একান্ত আবশ্যক। আর এটি এ দাবিও করে যে, তবলীগের কাজে অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডিও বিস্তৃত করা আবশ্যক। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই অন্যের রুচি সম্পর্কে জানা যায়।

অতএব আমাদের তবলীগি কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন। বছরে একবার বা দু'বার তরবীয়তি ও তবলীগি আশারা উদ্‌যাপন করলাম এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, এমনটি হওয়া উচিত নয়।

বর্তমানে এখানে অভিবাসন প্রত্যাশী বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ রয়েছেন। এদের অনেকে এমন আছেন, যারা সুস্থসবল এবং যুবা-বয়সের আর কতক আছেন কিছুটা বয়োবৃদ্ধ। তাদের মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অধিকাংশের হাতে সময়ও আছে। বেশির ভাগ সময় তাদের কোন কাজ থাকে না। অতএব এমন সব মানুষের উচিত, তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্য এবং বয়সের নিরিখে নিজেদেরকে তবলীগের কাজে পেশ করে। বইপুস্তক বিতরণের জন্য কম-বেশি যতটা সম্ভব সময় দেয়া উচিত। ভাষা না জানলে বইপুস্তক নিয়ে যান, ক্যাসেট ইত্যাদি নিয়ে যান। রাস্তায় যদি বইপুস্তক বিতরণ করতে হয়, তাহলে এর জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা থাকা উচিত আর এসব অভিবাসন প্রত্যশীদেরকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। এটি পুণ্য বা

সোয়াবেরও কারণ আর এতে তবলীগের দায়িত্বও পালন হবে। আর এর কল্যাণে হয়ত তাদের কেইসও দ্রুত পাস হয়ে যাবে। যাহোক স্থায়ীভাবে তবলীগের জন্য তবলীগ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসব দিক-নির্দেশনা যাওয়া উচিত এবং বইপুস্তক সহজলভ্য হওয়া উচিত আর এরপর সেসব দিক-নির্দেশনা অনুসৃত হওয়া উচিত এবং এমনভাবে কথা বলা উচিত যা 'হিকমত' শব্দের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। ওহদাদারদেরও এতে যোগ দেয়া উচিত আর পুরোনো লোকদেরও অংশ নেয়া উচিত। আমি অভিবাসন প্রত্যাশীদের কথা বলেছি বিধায় কেবল তারাই এতে অংশ নিবে এমনটি হওয়া উচিত নয়। দা'ঈয়ানে খুসূসী বা বিশেষ দাঈ-ইলাল্লাহ্দেরও কেবল নামেমাত্র দাঈ-ইলাল্লাহ্ (প্রচারক) হলে চলবে না বরং এখন বেশি সময় দিয়ে তবলীগের ময়দানে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে আমাদের এখন জগদ্বাসীকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে, তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে এবং খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে এ সঙ্কটাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব একটি পথই খোলা আছে আর তাহলো, খোদার দিকে ফিরে আস এবং সত্য ধর্মের সন্ধান কর।

مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -র ভিত্তিতে তবলীগ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করার অর্থেও এসেছে। অর্থাৎ কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ভাষায় তবলীগ করা উচিত।

অতএব প্রজ্ঞা ও সুন্দর নসীহত এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তা অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, আমি নিজেই প্রকাশ করব যে, কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তুমি বাহুবলে কাউকে হিদায়াত দিতে পারবে না। অবশ্য তোমাদের দায়িত্ব হলো তবলীগ করা, সত্যের বাণী প্রচার করা, সত্যের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় শিক্ষা অন্যদের সামনে প্রকাশ ও প্রচার করা।তোমরা তা অব্যাহত রাখ। মানুষ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না যে, সে বলবে– সময় নষ্ট করার পরিবর্তে যার ওপর প্রভাব পড়বে তার কাছে গিয়েই আমি পয়গাম পৌঁছাব। মানুষ তো জানে না যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাকে এই জ্ঞান দেয়াই হয় নি যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে আর কার ওপর পড়বে না। তাই খোদা তা'লার এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই যে, কেন তবলীগের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেল না বা কেন শতভাগ মানুষ আমাদের পয়গামে বা তবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল এতটুকুই জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছি কিনা? অথবা কেন আমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি এবং কেন খোদার নির্দেশ অনুসারে তবলীগ করি নি? কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমরা যদি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকি তাহলে এ পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুর পর অন্ততপক্ষে এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা তো ইসলামের সংবাদই পাই নি, আর আমরা যেহেতু ইসলামের সংবাদ পাই নি, তাই আমাদের কোন দোষ নেই।

অনেকেই পয়গাম শুনে এবং বুঝেও, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কিছু তাদের পথে বাদ সাধে, তারা সত্য গ্রহণ করে না। এই দু'দিন পূর্বে ইউরোপের একটি দেশের মুবাল্লিগ আমাকে লিখেছেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি,যারা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আর জার্মানিতে জলসায়ও যোগদান করেছিল এবং তবলীগ ও জলসার পুরো পরিবেশের খুবই ইতিবাচক প্রভাবও তাদের ওপর পড়েছে,বেশ কয়েকবার বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তার (অর্থাৎ এক ব্যক্তির বয়আত গ্রহণের) পথে কোন কিছু বাদ সাধে। এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য তারা পাবে কি পাবে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি, আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি।

তবলীগ সম্পর্কে কেউ কেউ আরো একটি কথা জিজ্ঞেস করে বা প্রশ্ন করে যে, তবলীগ করে তুমি কয়জনকে আহমদী বানিয়েছ? এছাড়া এটিও বলে যে, স্বয়ং মুসলমানরাই তোমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। আবার এটিও জিজ্ঞেস করা হয় যে, যেভাবে তোমরা তবলীগ কর আর ইসলামের বাণী প্রচার কর, সেভাবে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে কত সময় লাগবে? আর একই সাথে এটাও স্বীকার করে যে, বাহ্যত তোমাদের কথাই যুক্তি ও প্রজ্ঞাসম্মত। আমাকেও অনেকেই প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন জায়গায় এটি জিজ্ঞেস করে। সম্প্রতি জার্মানী সফরেও এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছে। অতএব আমাদের উত্তর সবসময় এটিই যে, আমাদের জন্য নির্দেশ হলো তবলীগ করা এবং বার্তা পৌঁছানো, আমরা তা থেকে পিছিয়ে যেতে পারি না এবং যাবও না। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না, এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব রয়েছে, তা আমরা পালন করে যাব। কিন্তু একই সাথে খোদার এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাই আমরা এই আশায় বুক বাঁধি যে, ইনশাআল্লাহ্ আমাদের শ্রেণিই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে!

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এর ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি রয়েছে। অতএব নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে যে, কীভাবে অনেক সময় ইসলাম-বিরোধীরা তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও এই আয়াতের শিক্ষা শিরোধার্য করে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং ঝগড়াবিবাদ যাতে ছড়াতে না পারে, সে মর্মে তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, এ সম্পর্কে স্বীয়পুস্তকে তিনি লিখেন:

"আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, উত্তর দিতে গিয়ে আমরা কখনো কোমলতা এবং নমনীয়তাকে বিসর্জন দেই নি। (অর্থাৎ এটি কখনো হয় নি যে, আমরা কোমলতা আর নম্র ভাষণকে পরিত্যাগ করেছি) সবসময় কোমল এবং নরম ভাষায় কথা বলেছি। অবশ্য অনেক সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর রচনা দেখে সংগত মনে করে সংশোধনের

অতএব আল্লাহ্ তা'লা, প্রজ্ঞা ও সুন্দর নসীহত এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তা অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, আমি নিজেই প্রকাশ করব যে, কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন।

উদ্দেশ্যে আমরা কিছুটা কঠোরতাকে এজন্য অবলম্বন করেছি, (অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে কঠোর হয়েছি, কেননা বিরুদ্ধবাদী দুষ্ট আলেমরা এবং দুষ্কৃতিতে সীমালঙ্ঘনকারী নেতারা সাধারণ মানুষকেও উত্তেজিত করে ও খেপিয়ে তুলে। তাই এই কঠোরতা তাদেরকে উত্তর দেয়ার জন্য এবং তারা রচনায় যা লিখেছে, এটি তারই অনুরূপ বা সেরূপ লেখাই আমরা লিখেছি।) যাতে করে মানুষ এভাবে সমুচিত উত্তর পেয়ে দুর্বার উত্তেজনাকে দমন করে।" (আর এটি এজন্যও যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হলে তিনি সে উত্তর, ততটা কঠোরতার সাথেই দিয়েছেন, যতটা দেয়া যায়। এর বেশি উত্তেজনা দেখানোর প্রয়োজন নেই আর এর বেশি ক্রোধান্বিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই যার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে পারে।) তিনি (আ.) বলেন,"আর এ কঠোরতা রিপুর তাড়নায়ও নয় এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়েও নয়, বরং আয়াত وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (সূরা আন্ নাহাল: ১২৬)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে।" অনেক সময় কঠোর হতে হয়, তো সেই কঠোরতাও এই আয়াতের শিক্ষা অনুসারেই হয়ে থাকে। আর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবেই এটিকে অবলম্বন করা হয়েছে, অর্থাৎ এমনভাবে কথা বল যা সঠিক এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে হয়। আর সেই মুহূর্তে বিরোধীকে অনুরূপ উত্তর দেয়াই আবশ্যক হয়ে পড়ে, এ কারণেই অনেক সময় কঠোরতাও প্রকাশ পায়; কিন্তু সার্বিক নীতি হওয়া উচিত কোমলতা প্রদর্শন। তিনি বলেন, "এই আয়াতের ওপর আমল করে এটিকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু এটিও সেই সময়, যখন বিরোধীদের অবমাননা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অপমানজনক কথাবার্তা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে আর আমাদের নেতা ও মনিব এবং সমগ্র বিশ্বের গর্ব রসূল (সা.) সম্পর্কে এমন নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব এমন সময় আমরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি।" (আলবালাগ, রূহানী খাযায়েন, ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

অতএব যেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেখানে وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ এর অর্থ হলো– দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে সেই একই কর্মপন্থা অবলম্বন করে কিছুটা কঠোরতার সাথে উত্তর দেয়া।অতএব মূল উদ্দেশ্য হলো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের পথ বন্ধ করা আর সঠিকভাবে বাণী পৌঁছানো। এগুলো আবশ্যকীয় বিষয়। তিনি কখনো সেই পন্থা অবলম্বন করেন নি, যা বিরোধীরা করেছে। এর পরিবর্তে তিনি এটিও বলেছেন যে, সরকারের কথা মানা এবং আইন মেনে চলা আবশ্যক। আর অশান্তি যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য তিনি যুক্তির ভিত্তিতেই কথা বলেছেন এবং আইনের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক, সেখানে তিনি আত্মাভিমানও দেখিয়েছেন।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা অধিক নমনীয় হয়ে কপটতা করে বাস্তবতা-পরিপন্থি কথাকে গ্রহণ করে নেবো। যে ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি করে এবং আমাদের রসূল (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, তিনি মিথ্যাবাদী হবেন! (নাঊযুবিল্লাহ্) আর হযরত মূসার নাম ডাকাত রাখে, এমন মানুষকে কি আমরা সত্যবাদী বলতে পারি? এমন করাকে কি **'মুজাদেলায়ে হাসানা'** বলা যেতে পারে? মোটেই নয়। বরং এটি কপটাচার আর ঈমানহীনতার লক্ষণ।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫শ খণ্ড, পৃ: ৩০৫, টীকা)

অতএব এ বিষয়গুলোর পার্থক্যও আমাদেরকে সবসময় এজন্য সামনে রাখতে হবে যে,তবলীগ করতে হবে বলে কপটতা যেন প্রকাশ না পায়। আর অন্যদেরকে কথা শোনাতে হবে বলে আমরা যেন এতদূর চলে না যাই যে, আত্মমর্যাদাবোধই পুরোপুরি হারিয়ে যাবে! হ্যাঁ, ঝগড়াবিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু একটি সীমার ভেতর থেকে কখনো কখনো তাদের কথাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হয়। অতএব আপত্তির ক্ষেত্রে বিরোধী যেখানে সীমা ছাড়িয়ে যায় বা তাদের কথায় যদি সীমাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য থাকে এবং নোংরা শব্দ থাকে, তাহলে অনেক সময় সেখানে নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার জন্য উত্তর দিতে হয়। অনুরূপভাবে তিনি (আ.) এটিও বলেছেন যে, নম্রতার বা কোমলতার অর্থ আদৌ এটি নয় যে কপটতা প্রদর্শন করবে আর এতটা ভয় পাবে যে, তাদের কথায় সায় দেবে এবং বাস্তবতা পরিপন্থি কথা মেনে নেবে; যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ভাষার কোমলতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র

প্রদর্শন করাও আবশ্যক কিন্তু ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করাও আবশ্যক।

অতএব এ কথাটিও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার অর্থ ভীরুতা নয় বা নিজের কাছে টানার জন্য ভ্রান্ত কথার সত্যায়ন করাকে প্রজ্ঞা বলা হয় না। উদাহরণস্বরূপ আজকাল জগত-পূজারীরা স্বাধীনতার নামে এমন আইন প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি শরীয়ত আদৌ দেয় না। আর তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে তারা বলে যে, আহমদীরাও প্রগতিশীল হওয়ার দাবি করে আর উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং ভাব দেখায় যে, আমরা কট্টরপন্থী নই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এরাও কট্টরপন্থী। আর এর উদাহরণ দিতে গিয়ে মহিলাদের সাথে করমর্দনের বিষয়টি নিয়ে আসে বা সমকামিতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। সম্প্রতি জার্মান সফরে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছে আর আমার উত্তরে তাদের কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্যও করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, বাস্তবতা কী। ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই, কিন্তু যা ভুল বা যা ভ্রান্ত, সেটিকে আমাদের অবশ্যই ভ্রান্ত আখ্যায়িত করতে হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক রাজনৈতিক দলের সদস্য, যার সম্পর্কে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি পার্টির নেতৃত্বের দৌড়ে অংশ নিবেন, তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি দলনেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না। কেননা, প্রথমত তিনি সমকামিতার বিরোধী, এছাড়া তিনি গর্ভপাতেরও বিরোধী। তিনি বলেন, আর এই উভয় বিষয় এমন, যার বিরুদ্ধে কথা শুনার মনমানসিকতা আমাদের সমাজে নেই। সমকামিতার প্রশ্ন যতটুকু আছে, কুরআন ও বাইবেল উভয় কিতাবে জাতিগত পর্যায়ে এমন পাপে লিপ্তদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে আমরা বৈধ মনে করি। যাহোক, এটি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, তিনি বুঝেন না।

অনুরূপভাবে, আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা কয়েক মাস পূর্বে নিজ দলের নেতৃত্ব থেকে এজন্য পদত্যাগ করেছেন যে, তিনি সমকামিতার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, এর কারণে আমি আমার বিশ্বাস এবং রাজনীতির মাঝে বিরোধ দেখছিলাম। তাই আমার জন্য উত্তম হবে নিজের ঈমান বা বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়া।

অতএব এরা, যারা বস্তুবাদী এবং যাদের ধর্মও সঠিকরূপে বিদ্যমান নেই, তারা যদি ধর্মের খাতিরে নিজেদের জাগতিক বিষয়াদিকে উৎসর্গ করে আর কপটতা ও ভীরুতা প্রদর্শন না করে, তাহলে আমরা যারা শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের মান্যকারী,আমাদের ঈমান কতটা দৃঢ় হওয়া উচিত আর (কতটা দৃঢ়তার সাথে) জাগতিক সম্পর্কের গণ্ডিতে এবং তবলীগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে এসব কথার খণ্ডন করা উচিত। জাগতিক স্বার্থে এসব বিষয়কে ভয় পাওয়াও উচিত নয় আর তাদের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের কথায় সায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা হলে কোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। এছাড়া পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন যে, কে হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য তা আমি ভালো জানি। অতএব খোদা যাকে হিদায়াত দিতে চান তার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উন্মুক্ত করে দিবেন। পদধারীদের বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি দেখেছি, তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। বিরোধিতার কোন পরোয়া করা উচিত নয়। বিরোধিতা তবলীগের পথই উন্মোচন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: "মিথ্যা যত প্রবলভাবে সত্যের বিরোধিতা করে, সত্যের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, জৈষ্ঠ্য মাসে তাপমাত্রা যত বাড়ে, শ্রাবণ মাসে ততবেশি বৃষ্টি হয়।" (অর্থাৎ মে-জুন মাসে গরম বা তাপমাত্রা যতটা বৃদ্ধি পায়, বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে যখন মৌসুমিবায়ু আসে, সে সময় বৃষ্টিও অনেক বেশি হয়।) তিনি বলেন, "এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সত্যের বিরোধিতা যত প্রবল হয়, ততই তার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় এবং স্বীয় প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার লাভ করে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যেখানে যেখানে আমাদের সম্পর্কে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানেই এক জামা'ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর যেখানে মানুষ কথা শুনে নীরব-নিষ্ক্রিয় থাকে, সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয় না।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

এ দৃশ্য আমরা আজও দেখতে পাই। সম্প্রতি জার্মানিতে আলজেরিয়া থেকে আগত সেখানকার এক প্রসিদ্ধ অ-আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, আলজেরিয়ায় এখন আপনাদের জামা'ত খুব কষ্টের সময় অতিবাহিত করছে। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগ দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আর মানুষ এখন জামা'ত সম্পর্কে জানে। তিনি বলেন, এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, সেটি হয়ত দশ-বিশ বছরেও আপনাদের প্রচেষ্টায় লাভ করা সম্ভব হতো না।এছাড়া সেখানকার আহমদীরাও এ কথা লিখেছে যে, পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হলেই অনেক অঞ্চল এমন রয়েছে, যেখানে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতএব বিরোধিতা বা জগতবাসীদেরকে কোনভাবে ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে হিকমত বা প্রজ্ঞাও আবশ্যক। তবলীগের জন্য আরেকটি আবশ্যিক কথা হলো, মানুষের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকা। অর্থাৎ যা বলে, তা যেন মেনেও চলে। প্রজ্ঞার কথাও মুখ থেকে তখনই বের হয় এবং অন্যদের ওপর তখনই প্রভাব বিস্তার করে, যখন কথা এবং কর্মে সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য থাকে।

এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন: "অনেকেই মৌলবি এবং আলেম আখ্যায়িত হয়ে মিম্বরে উঠে নিজেদেরকে রসূলের নায়েব এবং নবীর উত্তরাধিকারী আখ্যা দিয়ে বক্তৃতা করে আর বলে বেড়ায় যে, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও পাপাচার এড়িয়ে চল। কিন্তু তাদের কর্মের স্বরূপ দেখ এবং তারা নিজেরা যা করে বেড়ায়

তার ধারণা এটি থেকে করে নাও যে, তোমাদের হৃদয়ে এসব কথার কতটা প্রভাব পড়ে।” (তবলীগকারীর কথার প্রভাবও তখনই পড়বে, যখন তার কথা এবং কর্ম এক হবে।) তিনি বলেন,“এমন মানুষ যদি ব্যবহারিক শক্তি বা কর্মশক্তিও রাখতো, আর মানুষকে বলার পূর্বে যদি নিজেরা আমল করতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (সূরা আস্ সাফ্‌ফ: ৩) বলার কী প্রয়োজন ছিল?এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে কথা বলে নিজে আমল না করার লোক ছিল, আছে আর থাকবে। তোমরা আমার কথা ভালোভাবে শুন এবং ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, মানুষের কথা যদি আন্তরিক না হয় আর তাতে যদি কর্মশক্তি না থাকে, তাহলে তা প্রভাব বিস্তার করে না। আমাদের রসূল মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কেননা, যে সাফল্য এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের যে সৌভাগ্য তাঁর(সা.) লাভ হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এসব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তাঁর কথা এবং কাজে পুরো সামঞ্জস্য ছিল।” (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, “স্মরণ রেখো! (এখানে আমাদেরকেও নসীহত করছেন,) শুধু বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা আর ফাঁকা বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ আমল বা ব্যবহারিক শক্তি না হবে। কেবল কথা খোদার দরবারে কোন গুরুত্বই রাখে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٤

(সূরা আস্ সাফ্‌ফ: ৪)। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মু'মিনের দ্বিমুখী আচরণ করা উচিত নয় (বা কপটতা থাকা উচিত নয়)। ভীরুতা এবং কপটতা তার থেকে সবসময় দূরে থাকে। নিজের কথা এবং কর্মকে সর্বদা সঠিক রাখ এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি কর, যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন। তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

আরেক জায়গায় নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, “ইসলামের সুরক্ষা এবং এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাও। আর দ্বিতীয় দিক হলো, এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর।” (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩, সংস্করণ:১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

অতএব প্রথমে উত্তম আদর্শের ধারক হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর, এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর।সুতরাং তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। আর এভাবে রীতি অনুযায়ী তবলীগ করার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সে অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ সেপ্টেম্বর- ৫ অক্টোবর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৩৯, পৃ: ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

ওয়াকফে জাদীদ-এর গুরুত্ব ও কল্যান

সম্পাদনাঃ **শেখ মোস্তাফিজুর রহমান**, মুরব্বী সিলসিলাহ

সাইয়্যেদেনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব ও কল্যান সম্পর্কে যেসব উপদেশাবলী দান করেছেন তার সংক্ষিপ্ত নির্বাচিত অংশ তাঁরই ভাষ্যে আপনাদের সেবায় উপস্থাপন করছি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে হুযুরের এসব আদেশাবলীর উপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুন এবং উক্ত তাহরীকে বেশি বেশি অংশগ্রহনের সূযোগ দান করে বাধিত করুন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে ওয়াকফে জাদীদের তাহরীক শুরু হয়। জলসা সালানায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উক্ত তাহরিক করেন। যাদেরকে প্রথম সারির সদস্য নিযুক্ত করেন তাদের মাঝে জহুর আহমদ বশির সাহেবের নাম ছাড়াও হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব মাযহার (রা.) এর নামও অন্তর্ভূক্ত ছিল। ওয়াকফে জাদীদের সদস্য হিসেবে সর্ব প্রথম নাম ছিল জহুর আহমদ বশির সাহেবের অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর নাম সদস্যপদে অন্তর্ভূক্ত করেন। এরপর সম্ভবত হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব মাযহারের নাম দ্বিতীয় নাম্বারে ছিল। কিন্তু ওয়াকফে জাদীদের মজলিশে সাদারাতের পদে সারাজীবন হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব মাযহার (রা.) অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মাওলানা আবুল মুনির নুরুল হক সাহেবের নামও ছিল আর হযরত মৌলভী আবুল আতা সাহেবের নামও ছিল। হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের নামও ছিল আরো এক দু'জনের নাম ছিল অর্থাৎ মোট সাতজন সদস্য ছিল এ তাহরিকের শুরুতে। আর প্রথম ওয়াদা ছিল সে বছর সত্তর-বাহাত্তর হাজার রুপি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'লা বরকত দিলেন তখনকার আর আজকের হিসাব একেবারে আকাশ-পাতাল। আহমদী শিশুদের হৃদয়ে উক্ত তাহরিকের প্রতি ভালোবাসা যেন শৈশব থেকে শুরু হয়, উক্ত উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৬৬ সালে আতফালুল আহমদীয়া ওয়াকফে জাদীদের গোড়াপত্তন করেন। পূর্বে এ তাহরিক পাকিস্তান এবং ভারতের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর জহুর আহমদ বশির সাহেব উক্ত তাহরিক সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃতি দেন আর এখন পৃথিবীর একশত দশটি দেশের অধিক দেশে (২০০৩ এ লেখা) উক্ত তাহরিক জারি রয়েছে।

প্রথম দিকে চাঁদা ছিল হাজারের কোটায় পরবর্তীতে তা লক্ষের কোটায় বরং কোটিতে উন্নীত হয়ে গেছে আর পৃথিবীর ঐ জাতিও আজ এ তাহরিকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যাদের পূর্বে ওয়াকফে জাদীদ-এর কুরবানীতে অন্তর্ভূক্ত করা হতো না অর্থাৎ ইউরোপ এবং অন্যান্য পশ্চিমা জাতিগুলো যথা আমেরিকা এবং কানাডা। (খুতবা জুমু'আ, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৬, ৫ জানুয়ারী ২০০১)

ওয়াকফে জাদীদ একটি ঐশী তাহরিক

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৯৫ সালের ৬ জানুয়ারী খুতবায় বলেনঃ ওয়াকফে জাদীদ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সকল তাহরিকের মাঝে সর্বশেষ তাহরিক ছিল। কিন্তু যেহেতু ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী এটি জারি করা হয়েছিল তাই এ বিষয়ে তাকে অনেক সুসংবাদ সম্বলিত সপ্ন দেখানো হয়েছিল আর যে উত্তাপ তার হৃদয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা এরূপ ছিল যে, তিনি একবার বলেন যে, আমার হৃদয়ে এতটা আবেশ আছে এ তাহরিকের জন্য, যদি জামা'ত আমার সঙ্গ না দেয়, আর যদি আমাকে আমার জমি-জমা বিক্রিও করতে হয়, আমার কাপড়-চোপড় বিক্রি করতে হয় তবুও আমি এ তাহরিক জারি করে ছাড়বো। অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি এমন দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন অথচ অসুস্থাবস্থায় মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'লার কৃপা সহকারে ওয়াকফে জাদীদকে যাতে পরবর্তীতে আল্লাহ তা'লা বরকত দিয়েছেন তা এ কথার বহিঃপ্রকাশ যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর হৃদয়ে ঐশী এ তাহরিক আন্দোলিত হয়েছে আর যে চিন্তা-চেতনা আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তা ঐশী উত্তাপই ছিল যা সমস্ত জামাতের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু হয় এমন কি এ তাহরিক এখন খোদা তা'লার কৃপায় অতি সুদৃঢ় হয়ে গেছে। (আলফযল ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

ওয়াকফে জাদীদ-এর মৌলিক উদ্দেশ্য

ওলী-আউলিয়াদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হলো ওয়াকফে জাদীদ এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ বিষয়েই ওয়াকফে জাদীদের চিত্রাঙ্কন করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় আউলিয়া এবং কুতুব জন্ম লাভ করছেন। ওয়াকফে জাদীদ প্রকৃতপক্ষে সর্বসাধারনের নয় বরং এর প্রেক্ষাপট ছিল গ্রামভিত্তিক যেন গ্রামে গ্রামে ওলি আওলিয়া সৃষ্টি হয়। গ্রামে গ্রামে খোদার ওলী এবং গওজ-কুতুব যেন সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়। তিনি (রা.) প্রারম্ভেই এ কথা বলেছে যে, আমি চাই ওয়াকফে জাদীদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে খোদার ওলী যেন সৃষ্টি হয় আর এ কারনে আমি স্বয়ং এর দেখভাল করবো এবং এটি অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ন্যায় হবে না বরং বিশেষকরে আমি মুআল্লেমিনদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো। যতদিন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল তিনি এ কাজ করতে থেকেছেন এবং পরবর্তীতে তা আর সম্ভব হয় নি কেননা হুজুর অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু হুজুরের আকাঙ্খা এমনি ছিল।

হুযূর আরো বলেন, আমি চাই, ওয়াকফে জাদীদ পূর্বের তুলনায় আরো অগ্রসর হয়ে এদিকে মনোযোগ দিবে যে, তাদের সমস্ত কর্মী কেমন কাজ করছে, তাদের মাঝে আল্লাহ তা'লার ওলী-আউলিয়া সৃষ্টি হচ্ছে কি না। যদি এদিকে মনোযোগ থাকে তাহলে আমি আশা রাখি, অধিক মনোযোগের সাথে, নিজেদের মস্তিষ্কে এ বিষয়টি জাগ্রত রেখে অধিক সম্ভাব্যতা সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমন বান্দা তার দৃষ্টিগোচর হবে আর সে তার নৈকট্য লাভ করবে যাকে ওলী বলা হয়। (খুতবা জুমুআ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আলফযল ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

ওয়াকফে জাদীদ পাকিস্তানের বাইরে বিস্তারের উদ্দেশ্য

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন: যখন আমি এ তাহরিক করি তখন আমার মাথায় এটা ছিল না যে, এতটা প্রয়োজন সৃষ্টি হবে কেননা তবলীগ তো চলছিল কিন্তু ধিমিতালে আর এর মাঝে সেই নতুন গতি এবং নতুন দ্রুতগতি সৃষ্টি হয় নি যা এখন আল্লাহ তা'লার কৃপায় সৃষ্টি হয়েছে আর তবলীগেরই চাহিদা যে, যা পূর্ণ করার জন্য নতুন অর্থনৈতিক চাহিদা সৃষ্টি হবে আর এর ফলে সাধারণ চাঁদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে সেই চাহিদা পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

উদাহরণস্বরূপ ওয়াকফে জাদীদের বিষয়ে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, হিন্দুস্তানের জামাতগুলো যেহেতু এখন দরিদ্র আর দেশ বিভাগের পর তাদের উপর অনেক বড় ধাক্কা লেগেছে যা এখনো তারা সামলে উঠতে পারে নি, তাই সেখানের ওয়াকফে জাদীদের প্রয়োজনীয়তা তাদের চাঁদার বিপরীতে অনেক বেশি।

এমনিভাবে আফ্রিকার জামাতগুলো যেহেতু অধিকাংশ দরিদ্র, না তারা নিজেদের চাদায় নিজেরা সয়ংসম্পূর্ণ, না ওয়াকফে জাদীদের নেযাম নিয়ম সেখানে জারি করলে, অথবা ওয়াকফে জাদীদের অধীনে তাদের তালীম তরবিয়ত করার জন্য আমাদের কাছে সেখানে কোন এমন ব্যবস্থা নেই যে আমরা দেশীয় পর্যায়ে তাদের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করতে পারি তাই আমি এ তাহরিক করেছি যে, পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে বাইরের দেশগুলো যেন এই তাহরিকে শামিল হয়ে যায় আর কেবল হিন্দুস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশই যেন এ সম্মানের অধিকারী না থাকে অর্থাৎ এ তিনটি দেশ এমন এক তাহরিকে অংশ নিচ্ছে যা বিশেষ করে আল্লাহর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অথচ অন্য দেশগুলো বঞ্চিত থাকবে এমনটি যেন না হয়।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা কোথায় কোথায় খরচ করা হয়

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৯৫ সালের ৬ জানুয়ারী খুতবায় বলেন: ওয়াকফে জাদীদ বাইরে যখন শুরু হলো, যদিও উক্ত চাদা থেকে অনেকটা সেই এলাকায় খরচ হয়েছে যে এলাকার উদ্দেশ্যে এ তাহরিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অর্থাৎ পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশ। কিন্তু হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর একটি দিব্যদর্শণ হয়েছিল যা থেকে অনুমেয় যে, খোদা তালার ইচ্ছা হলো, অবশেষে এ তাহরীকের কল্যান যেসব উদ্দেশ্যে খরচ হবে উক্ত উদ্দেশ্যে তা বাইরের দেশগুলোতেও বিস্তৃতি দিতে হবে আর কেবল পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশেই এটি খরচ হবে না বরং অন্যান্য জায়গাতেও এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ ওয়াকফে জাদীদের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তারা কেবল সাধারন চাঁদা কুরবানী স্বরূপ উপস্থাপন করবে না বরং উক্ত তাহরীকেও অংশগ্রহন করবে।

এ কারনে অর্থ বিভাগকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা এর শুরুটা করবো আফ্রিকা থেকে। আফ্রিকাতে প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অনেক দেশে অর্থনৈতিক মন্দার কারনে চাঁদায় দূর্বলতা দেখা যাচ্ছে। তাই ওয়াকফে জাদীদের একটি অংশ আমরা ইনশাআল্লাহ তা'লা আফ্রিকার দিকে ঘুরিয়ে দেব আর পরবর্তীতে এমন এক সময় আসবে যখন ইউরোপেও ওয়াকফে জাদীদের অধীনে আমাদের মোয়াল্লেম দিতে হবে আর এমন ধরনের কাজ জারি করতে হবে যা ইসলামের শেষ বিজয়ের জন্য আবশ্যক। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

ওয়াকফে জাদীদে বাইরের চাঁদাও আছে যা হিন্দুস্তান এবং আফ্রিকাতে খরচ করা হয়। এমন কি পাকিস্তান থেকেও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় যা অবশিষ্ঠ থাকে তা বাইরের দেশগুলোতে খরচের জন্য প্রেরণ করা শুরু হয়েছে। তাই এ বাহাস করার অবকাশ নেই যে, চাঁদা কে দিল আর কোথায় তা খরচ হওয়া উচিত। অর্থাৎ কে দিয়েছে এ বাহাস নয় আর এ বাহাসও নয় যে, যারা দিয়েছে তাদের জন্যই খরচ করা হবে। এ বাহাস হতে পারে যে, এ মুহুর্তে আন্তর্জাতিকভাবে কোন দেশের জন্য অধিক আবশ্যক আর কোন দেশ অতি দ্রুততার সাথে সত্যতার দিকে মনোযোগী হচ্ছে আর এ দিক থেকে তাদের প্রয়োজন বাড়ছে।

অতএব খরচের দিক দিয়ে জামাতে আহমদীয়া সর্বদা এ বিষয়টি সামনে রেখেছে আর কে বেশি দিয়েছে এ বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক ভেবেছে, কে বেশি দিয়েছে আর কে কম দিয়েছে তা সর্বদা অপ্রাসঙ্গিক ভাবা হবে। যেখানে প্রয়োজন বেশি সেখানেই অধিক খরচ করা হবে আর সর্বদা এমনটিই হয়েছে। অতএব এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, বাইরের দেশের চাঁদা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং হিন্দুস্তানের চাঁদার তুলনায় খোদা তা'লার কৃপায় অনেক বেড়ে গেছে আর ঠিক সেই মুহুর্তে এ বরকত লাভ হয়েছে যখন প্রচন্ড প্রয়োজন ছিল। (খুতবা জুমুআ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

ওয়াকফে জাদীদের কল্যান ও অনুগ্রহসমূহ

ওয়াকফে জাদীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা যে কল্যান দান করেছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। এটি তৃতীয় শ্রেণীর তাহরিক ছিল আর এর চেয়ে অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত জামাতের স্থায়ী চাঁদার নেযাম পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ওসিয়্যতের নেযাম ছিল, চাঁদায়ে আম এর নেযাম ছিল আর তাহরিকে জাদীদের গুরুত্ব তো অপরিসীম আর তাহরিকে জাদীদের বরকতে আল্লাহ তা'লার কৃপায় পৃথিবীতে ইসলামের অনেক সেবা দেয়া হয়েছে। অতএব এই তৃতীয় শ্রেনীর তাহরিক যা শুরুতে কেবল পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশের গ্রামগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেখুন! আল্লাহ তা'লার বরকত কত অপরিসীম। ওয়াকফে জাদীদের সিলসিলায় আল্লাহ তা'লা সেই মহান অনুগ্রহ করেছেন যে আত্মা খোদা তা'লার সম্মুখে এভাবে সিজদাবনত হয় যেন মাথা তুলতেই ইচ্ছে করে না, হ্যাঁ অন্য কাজের ব্যস্ততার কারনে মাথা উঠাতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'লার দয়া দেখে সমস্ত আত্মা সর্বদা খোদার সমীপে সিজদাবনত থাকার নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। ওয়াকফে

জাদীদে যে ওয়াদা করা হয়, চাঁদা আদায় হলে তার অধিক আদায় হয়ে যাচ্ছে– এটি খোদা তা'লার মহান মর্যাদার বর্হিপ্রকাশ বৈ আর কী? (খুতবা জুমুআ, ৬ জানুয়ারী ১৯৯৫, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

ঐশী সাহায্যের মৃদুমন্দ বাতাস

প্রয়োজন হয়েছে অথচ ঐশী সাহায্যের বায়ূ প্রবাহিত হয় নি– আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রয়োজন সামনে আসে নি। সর্বদা কোন ধরনের তাহরিক ছাড়াই, অধিক হারে ঠিক প্রয়োজনের মুহুর্তে আল্লাহ তা'লা প্রয়োজন পূর্ণ করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অতএব আপনারা সুরক্ষিত দূর্গে আছেন, আর কেবল তা-ই নয় বরং আপনাদের হৃদয়ের সততা এ কথার প্রমান দেয় কেননা খোদা তালার এ প্রতিশ্রুতি সত্য লোকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যারা খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে, না কেবল জগতকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁর পথে নিজেদের শক্তিসমূহ এবং নিজেদের সম্পদ খরচ করে, তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি আর আমাদের ক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে। অতএব সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, আল্লাহ তা'লা এ খরচকারীদের হৃদয়ের উপর দৃষ্টি রাখছেন আর তাদের পুন্যসমূহ এবং তাদের নিষ্ঠা কবুল করেছেন আর এটি কবুলিয়্যতের নিদর্শণ যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহ করুন, এ কবুলিয়্যতের নিদর্শণ সর্বদা এমনিভাবে আমাদের পক্ষে যেন প্রকাশিত হতে থাকে। (খুতবা জুমুআ ২ জানুয়ারী ১৯৯৮, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

ওয়াকফে জাদীদ তালীম তরবিয়তের একটি বড় মাধ্যম

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন: নিশ্চই এ তাহরিক আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হৃদয়ে উদ্রেগ করা হয়েছিল কেননা হঠাৎই তবলীগে এমন গতি সঞ্চার হয়ে গেল আর দুনিয়ার দৃষ্টি আহমদীয়াতের দিকে এমন গতির সাথে বাড়তে থাকলো যে, তাদেরকে তবলীগ করা তো অন্য বিষয়, তাদের তরবিয়তের দায়িত্বভার পালনের জন্য অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। কেননা তাদের মধ্য থেকেই মোবাল্লেগ বের করা, তাদের তরবিয়তের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় জলসার মাধ্যমে আর তরবিয়তি ক্লাসের মাধ্যমে ধর্মের বিস্তারিত বিষয় বুঝানো যা সাধারনত না বুঝে সাধারন লোকেরা বয়াত করে থাকে আর এ বিষয়টি সারা দুনিয়াতে কেবল আহমদীয়াতের জন্য একচ্ছত্র নয়, পৃথিবীর সব ধর্মেরই একি অবস্থা। সাধারন জনগন সাধারনত একটি বিশ্বাস স্বীকার করে নেয়। অনেকে নিদর্শন দেখে, অনেকে গতিবিধি দেখে আর অনেক সময় আকাশ থেকে এমন সহায়ক নিদর্শণ প্রকাশিত হয় যা দেখে তারা বিশ্বাস করে ফেলে যে, এটি সত্যিকার সিলসিলা কিন্তু তাদের বিশ্বাসের বিস্তারিত বিষয়, এগুলোর উপর কীভাবে আমল করতে হবে এ বিষয়ে অনেক সময় তারা অবগত থাকে না। তাই কুরআন করিম সেই নেযাম জারি করেছে যে, নিজেদের কেন্দ্রে প্রথমে বিভিন্ন জাতির নেতাদেরকে আহ্বান করো যারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাদেরকে কেন্দ্রে ডাকো, তাদেরকে কেন্দ্রে অবস্থান করাও, তাদের তালীম-তরবিয়ত করো এরপর তাদেরকে ফেরত পাঠাও যেন তারা নিজেদের অবস্থানে ফেরত গিয়ে ধর্মের সেবার দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করতে পারে। আর এ প্রয়োজনের কারনেই খোদা তা'লা পশ্চিমা জামা'তগুলোতে অর্থাৎ স্বাধীন ঐ দেশগুলোতে যারা উন্নত দেশ তাদেরকেও এ তাহরিকে অংশগ্রহনের সূযোগ দিয়েছেন আর আল্লাহ তা'লা এর অনেক উত্তম ফলাফল আমাদেরকে দেখিয়েছেন যা আমাদের ধারনারও অতীত ছিল। (খুতবা জুমুআ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আলফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

ওয়াকফে জাদীদ ব্যবস্থাপনার মাঝে একটি পরিবর্তন

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ৬ জানুয়ারী ১৯৮ খুতবা জুমাআতে বলেন: জামাতে আল্লাহ তা'লার কৃপায় এখন কোটির অধিক নতুন আহমদী অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আর তাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তরবিয়তের যে নেযাম জারি হচ্ছে এখনো পরিপূর্ণভাবে যথেষ্ট নয়। যদি আমরা ওয়াকফে জাদীদেও তাদের দিকে পূর্ণমাত্রায় মনোযোগী হতাম তাহলে তা তাদের ইমান এবং নিষ্ঠায় অনেক প্রবৃদ্ধির কারন হতো। তাই এখন প্রত্যেক জামাতে যারা নতুন আহমদী হচ্ছে তাদের জন্য ওয়াকফে জাদীদের এক ভিন্ন সেক্রেটারী নির্ধারন হবে। তারা বিশেষ করে এ বিষয়ে কাজ করবে। যদি কেউ এক আনাও দেয় তা-ও গ্রহন করা হোক। কিন্তু নতুন আগমনকারী আহমদীরা অধিকহারে উক্ত তাহরিকে যেন অংশগ্রহন করে। এর ফলে আমাদের এই যে তালিকা আছে সেখানে লক্ষের বদলে পরবর্তী কয়েক বছরের মাঝে কোটিতে পৌঁছে যাবে আর ওয়াকফে জাদীদের এ কল্যান অনেক বড় কল্যান বলে পরিগনিত হবে যা সকলে লাভ করবে আর আগত ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি উক্ত কল্যান থেকে উপকৃত হতে থাকবে।

তাই আজ থেকে আপনাদের জামাতে ওয়াকফে জাদীদের একজন পরিপূর্ণ সেক্রেটারী নও মোবাঈন মনোনীত করুন আর সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হবেন তার দায়িত্ব হবে পূর্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তাদের সন্তানদের জন্য চিন্তা করা, প্রতুল আমদানির বিষয়ে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বৃদ্ধি করার কাজ স্কন্ধে। এভাবে দু'জন কাজ করলে আশা করা যায় আগামী বছর ইনশাআল্লাহ এর অতি চমৎকার ফল আপনাদের সামনে প্রকাশিত হবে। (আফ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

চাঁদা দাতার সংখ্যা বাড়ানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হোক

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন: "চাঁদায় প্রবৃদ্ধি নিজ সত্ত্বায় আনন্দদায়ক কিন্তু যারা চাঁদা দেয় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা আরো অধিক আনন্দদায়ক। এর অর্থ অধিকহারে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা খোদা তা'লার রাস্তায় খরচ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। (খুতবা জুমুআ, ১ জানুয়ারী ১৯৯৯, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯)

যতদূর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়টি, এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুজাহিদদের সংখ্যা যেন অধিক হয় কেননা বিশেষ করে যেসব নও মোবাইনদের শুরু থেকেই স্বাচ্ছন্দে চাঁদা দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে পরবর্তীতে তারা আরো অগ্রসর হয়ে, মনখুলে চাঁদা দেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। (খুতবা জুমুআ, ৫ জানুয়ারী ২০০১, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১)

তাই আমি যেভাবে পূর্বে গুরুত্বসহকারে বলেছিলেন যে, আমাদেরকে কুরবানীকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে কেননা যে-ই একবার

কুরবানীকারীরর সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত হবে, আল্লাহ তা'লার আইন কর্যায়ে হাসানা বৃদ্ধিকারী তার প্রতি আরোপিত হয়। তার পুন্য বৃদ্ধি হয়, সম্পদে প্রবৃদ্ধি হয়। এমন সন্তান বড় হলে যেখানেই ইনকাম করবে সেখানেই আল্লাহ তা'লা বরকত দিবেন। তাই পরবর্তী বংশধরদের ওয়াকফে জাদীদ সামলানোর জন্য ব্যবহার করুন আর ওয়াকফে জাদীদে অধিকহারে সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। সামান্য কুরবানীই হোক না কেন তাদেরকে অবশ্যই অংশগ্রহন করান। (খুতবা জুমুআ, ২ জানুয়ারী ১৯৯৮, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

নও মোবাঈন তথা নবদীক্ষিতদের অতিসত্ত্বর উক্ত তাহরিকে শামিল করা হোক

নও মোবাঈন যেহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুসারে চাঁদাদাতাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। যারা বয়াত করে তাদের প্রাথমিক অবস্থা হলো, তাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাদের কিছু না কিছু প্রয়োজন, অর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করার জন্য বিভিন্নভাবে কিছু খরচ করতে হয়। জলসায় ডাকলে তাদের আসা-যাওয়ার খরচ দিয়ে ডাকা হয়। কিন্তু শুরুতে কিছুটা কুরবানী করা আবশ্যক। যদি কোন কুরবানী না করে তারা ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে কুরবানীর স্বাদ বুঝানো আপনাদের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। তারা বুঝবেই না যে, কুরবানীর স্বাদ কী? তাই তাদেরকেও ওয়াকফে জাদীদে অন্তর্ভূক্ত করুন। (খুতবা জুমুআ, ৬ জানুয়ারী ১৯৯৫, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

নও মোবাঈনদেরকে অবশ্যই শামিল করুন তা যত সামান্য অর্থই হোক না কেন। একবার যখন খোদা তা'লার পথে ভালোবাসার সাথে কিছু উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ হবে সে তখন এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে বা স্বাদ লাভ করবে আর সারা জীবন এ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারবে না। তাই তাদের থেকে প্রথমে বড় বড় বা ভারি ভারি চাঁদা আদায় করবেন না। প্রথমে যতটা সামর্থ আছে ততটাই নিন যেন ভালোবাসার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত থাকে। একবার যদি নতুন আগমনকারীদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা অর্পন করেন আর বলেন, অবশ্যই তোমরা ষোল ভাগের এক ভাগ প্রদান করবে আর অমুক তাহরিকে এত দাও আর তমুক তাহরিকে এত দাও। এমন করলে সেদিন দূরে নয়, যারা দূর্বল তাদের কোমর ভেঙে যাবে আর ঈমানে প্রবৃদ্ধির বদলে তারা পূর্বাবস্থা থেকেও আরো নিচে নেমে যাবে, তাই হিকমত খাটিয়ে কাজ করুন। খোদা তা'লা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক আর মানুষ স্বেচ্ছায় ভালোবাসাস্বরূপ যতটা সাধ্য সে অনুযায়ী তার কাছ থেকে নিবে। কিন্তু প্রত্যেকে তো কিছু না কিছুর তৌফিক রাখে। যদি সামান্য টাকাও সে খুশিমনে দেয় তাহলে তা-ও নিয়ে নিন আর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করুন। (খুতবা জুমুআ, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬)

একনিষ্ঠ নও মোবাঈন

যে গতিতে চাঁদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমি মনে করি, ইনশাল্লাহ তা'লা পরবর্তীতে ঐ চাহিদাগুলো চাঁদা থেকেই পূর্ণ হবে, কোন নতুন তাহরিকের প্রয়োজন হবে না। আর বিশেষভাবে এ কারনে আমি আশা করি যে, ইউরোপে যারা নতুন আহমদী হচ্ছে, তাদের মাঝে বিশেষকরে আলবেনিয়ান বংশধরের লোকদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর প্রকৃত স্পৃহা পাওয়া যায়। আর অনেকে এমন আছেন যারা খুব জোরে-শোরে জিজ্ঞেস করে করে যে, অন্যরা কত দেয় আমাদের কাছ থেকেও তা নাও, সব কিছু নিয়ে নাও। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তাদের মাঝে অবাক করার মত কুরবানীর স্পৃহা আছে অর্থাৎ আলবেনিয়ান লোকদের মাঝে। অতএব এ লোকেরা যখন উঠে দাঁড়াবে, যখন তাদের তৌফিক বৃদ্ধি পাবে, সেদিন দূরে নয় বরং পরবর্তী কয়েক বছরের মাঝে বাইরে থেকে সাহায্য নেয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরাই বাইরের লোকদের জন্য সাহায্যকারী বিবেচিত হবে। (খুতবা জুমুআ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

এখন অধিকহারে নও মোবাঈনদের যুগ আর আমরা এখন পূর্ণ মনোযোগী যে, প্রত্যেক নও মোবাঈন যেন খোদা তা'লার পথে খরচকারী হওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করে আর আমরা আশা রাখি এ তাহরিক সফল হবে, ইনশাআল্লাহ। এখন পর্যন্ত এর ভালো ফল প্রকাশ পাচ্ছে আর অধিকহারে নও মোবাঈন খোদা তা'লার পথে খরচ করার অভ্যাস সৃষ্টি করছে আর ওয়াকফে জাদীদের পথেও উক্ত নও মোবাঈনদের শামিল হবার সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে। (খুতবা জুমুআ, ৭ জানুয়ারী ২০০০ সাল, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সাল)

আতফাল দপ্তরের রেকর্ড রাখা আবশ্যক

ওয়াকফে জাদীদের যে আতফাল রেকর্ড আছে তা পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশে রাখা হয় কিন্তু অন্যান্য দেশে রাখা হয় না আর আমরা চাই, বাচ্চারাও যেন অধিকহারে এ তাহরীকে অংশ নেয়। যেভাবে শিশুই ধর্মে নও মোবাঈন হয়ে থাকে বয়স যতই হোক না কেন। ঠিক সেভাবে বাচ্চাদেরকেও শুরুতে ওয়াকফে জাদীদে শামিল করা হলে পরবর্তীতে অন্য ধরনের চাঁদায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে দিবেন, তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিবেন। তাই আমাদের বাইরের জামাত থেকে এমন খবর আসা দরকার যে, এত অধিক শিশুদেরকে আমরা উক্ত তাহরিকে অন্তর্ভূক্ত করেছি এমন কি প্রথম দিনের শিশুও উক্ত তাহরিকে অংশগ্রহন করেছে" (খুতবা জুমুআ, ৬ জানুয়ারী ১৯৯৫, আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সাল)

উক্ত তাহরীকে যথাসাধ্য অংশগ্রহন করুন

যেহেতু চাঁদায়ে আমের দায়িত্ব অনেক জামাত পালন করছে তাই আমি এ তাহরিককেও অন্যান্য তাহরিকের ন্যায় এমন ভাবে পেশ করছি যে, সাধারন আহমদীরা যারা চাঁদায়ে আমে সাধ্যানুযায়ী অংশগ্রহন করছেন এবং তাদের জন্য অধিক বোঝা উঠানো সম্ভব নয় তারা কেবল তাবাররুক হিসেবে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে এ তাহরিকে শামিল হবে আর যারা সম্পদশালী, যাদেরকে খোদা তা'লা অধিক সৌভাগ্য দান করেছেন তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী নিজেরা সিদ্ধান্ত নিবেন এবং তারাই এ বোঝা বহনের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবেন। (খুতবা জুমুআ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ সাল)

কুরবানী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালের খুতবায় বলেন: আপনাদের কুরবানী কেবল এ উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি করবেন না যে, আপনাদের

নাম উল্লেখ করা হবে। আপনাদের মাঝে প্রতিযোগীতার রূহ সৃষ্টি হোক যা আপনাদের স্লোগান আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে, "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস" আল্লাহ তা'লা আরো বলেন, "লিকুল্লি বিজহাতুন হুয়া মুয়াল্লিহা, ফাসতাবিকুল খাইরাত" প্রত্যেকের জন্য একটি গন্তব্য আছে যেদিকে সে অগ্রসর হয়, সে এর অনুসারী হয় এবং এর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে দেয়। "ফাসতাবিকুল খাইরাত" তোমাদের গন্তব্য যেদিকে তোমরা মুখ করে আছ, তোমাদের একে অপরের তুলনায় পুন্যে অগ্রসর হতে হবে। অতএব এ অনুযায়ী কুরআন আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের গন্তব্য বলেছে পুন্যের ক্ষেত্রে সামনে অগ্রসর হওয়া। যদি কোন মানুষ তার ভাই এর তুলনায় সামনে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয় তাহলে তাকে অবশ্যই লোকদেখানো বলা যায় না। কিন্তু এ নিয়্যতের তুলনায় আরো উন্নতমানের নিয়্যত আছে যার মাঝে প্রথম হলো, খোদার প্রতিচ্ছবি যেন মাথায় থাকে আর কোন চাঁদা এমন যেন আদায় করা না হয় যাতে খোদা তা'লার সংমিশ্রন নাই। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

পিতা-মাতা উত্তম-নীতি প্রতিষ্ঠা করবে

মা-বাবা নিজ সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখবে আর যখন তারা আয় করবে তখন তাদেরকে এ তাহরিক করবেন যে, প্রথম সপ্তাহের কামাই যেন তারা মসজিদে দিয়ে দেয় আর এ নেক নীতি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত। আর আমার কাছে পরামর্শ চাইলে আমি সবাইকে এ কথাই বলি যে, প্রথম সপ্তাহের আয় মসজিদে দিয়ে দাও। দ্বিতীয়ত নিয়মিত চাঁদা দেয়া শুরু কর। যদি অধিক দেয়ার সামর্থ না থাকে তবে অন্তত ষোল ভাগের এক ভাগ অবশ্যই দাও। আল্লাহ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে, তোমাদের সন্তানও তোমাদের জন্য ফিতনা, এক্ষেত্রেও ফিতনা হতে পারে। মা-বাবা মনে করে, সন্তান ভালোই আছে, আমরা তো চাঁদা দিচ্ছি, তাকে কেন খালি খালি চাঁদার মাঝে ফেলতে যাবো। এর অর্থ হলো, আপনারাও হেরে গেলেন। আপনাদের চাঁদাও বেকার গেল। যদি চাঁদার শখ না থাকে এবং সৌভাগ্যের কারন মনে না করেন তাহলে সন্তানকেও আপনারা এ তাহরিকে অংশগ্রহন করাতে সমর্থ হবেন না। (খুতবা জুমুআ ৬ জানুয়ারী ১৯৯৫, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সাল)

আহমদী জামা'তের সদস্যদের জীবন-যাপন

সাইয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন: সমস্ত পৃথিবীতে জামাতে আহমদীয়া যে প্রত্যেক প্রকারের চাঁদা দিচ্ছে সেখানে যখন ওয়াকফে জাদীদ যোগ করা হলো তখন অন্যান্য চাঁদায় ভাটা পড়ে নি। বরং চাঁদা আরো বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে। এ এক এমন বিষয়, যতই বোঝা চাপানো হোক না কেন গতি আরো বেড়ে যায়, কোন অবস্থায় ঘাটতি হয় না। যে দিক থেকেই দেখ না কেন, এটি জামাতে আহমদীয়ার জীবন পদ্ধতির নিদর্শণ আর ততদিন পর্যন্ত তা উজ্জীবিত থাকবে যতদিন আপনাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতা জীবিত থাকবে, যতদিন আপনাদের মাঝে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকবে, যতদিন আপনারা আপনাদের খরচ উক্ত আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী করবেন যেখানে আমাদের বলা হয়েছে "তোমরা ভালোবাসার খাতিরে খোদার সম্মুখে নিজেদের সম্পদ পেশ করবে এবং ভয় পেয়ো না। তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি এমন কৃপাবারি বর্ষণ করবেন যে, তোমরা এর ফলে নিজেরাই হতবাক হয়ে যাবে।

প্রতি বছর জামাতের আর্থিক কুরবানীতে প্রবৃদ্ধি এক দিকে এ কথার প্রমান বহন করে যে, জামাতে আহমদীয়া নিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছে সেখানে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, খোদা তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে চলেছেন আর এত-শত কুরবানী সত্ত্বে জামাত দরিদ্র হয়ে যায় নি বরং পূর্বের তুলনায় আরো ধনী হয়ে গেছে। (খুতবা জুমু'আ, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ সাল)

জামাতে যদি আর্থিক কুরবানীতে প্রবৃদ্ধি হয় তাহলে বুঝতে হবে খোদাভীতির মানও উন্নত হচ্ছে

জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যদি আর্থিক কুরবানীতে প্রবৃদ্ধি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, খোদা তা'লার কৃপায় তাকওয়া তথা খোদাভীতির মান বাড়ছে, খোদা তা'লার কৃপায় তাদের লোভ বা চাহিদা কমছে। জাগতিক কারো সাধ্য নেই এমন জামাত প্রতিষ্ঠা করার। যদি থাকে তাহলে তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ, তারা এমন জামাত বানিয়ে দেখাক। (খুতবা জুমু'আ, ৬ জানুয়ারী ১৯৯৫, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)

খোদার কৃপাবারির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে খোদা তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হবার জন্য আজ যে উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে তা আল্লাহ তা'লার কৃপায় উক্ত প্রতিশ্রুতিরই পূর্ণতার বর্হিপ্রকাশ যা দেখে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

"আমি আশা রাখি যে, যেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক সেভাবে আপনারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। কেননা যখন কৃপাবারি বৃদ্ধি পায় আর কৃতজ্ঞতা না করা হয় তাহলে তা খুবই কষ্টদায়ক এবং ভারসাম্য নষ্ট করার নামান্তর। সমানতালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত আর হৃদয়ে এ অনুভুতি থাকা দরকার যে, যতই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে তিনি ততই কৃপাবারি বাড়াতে থাকবেন যা ধারন করা সাধ্যাতীত প্রতীয়মান হবে। অথচ আমরা কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্বদা পিছেই থাকছি, সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছি না আর এ অনুভুতিই কৃতজ্ঞতার অনুভুতি বৃদ্ধি করে, আল্লাহকে স্মরণ করার শক্তি বৃদ্ধি করে, খোদা তা'লাকে স্মরণ করার মাঝে প্রেম সৃষ্টি করে। তাই আমি আশা রাখি, খোদা তা'লার কৃপাসহ জামাত সর্বদা যেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক সেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর আল্লাহ কে স্মরণ করার মাধ্যমে হৃদয়ে নূর সৃষ্টি করার মাধ্যমে এ ময়দানে সর্বদা সম্মূখে অগ্রসর হতে থাকবে। (খুতবা জুমু'আ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ সাল)

তথ্যসূত্র: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারী ২০০৩ সাল।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২০তম কিস্তি)

নিষ্ফল, বৃথা কার্যকলাপ নিরুৎসাহিতকরণ

উক্ত বিষয়ে আরও বলতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিয়েছেঃ

“এবং সকল বৃথা কার্যকলাপ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (আল মু’মিনুন- ২৩:৪)

যারা বিজ্ঞ, তারা অর্থহীণ কার্যকলাপে অযথা তাদের শক্তি অপচয় করা থেকে বিরত থাকে।

লঘু আমোদ-প্রমোদের জন্য কিছুটা সময় করে নেওয়াটা খারাপ কিছু নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। কিন্তু আমোদ-প্রমোদ যদি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তাহলে সেটাকে কোনমতেই অনুমোদন দেয়া যায় না। তাছাড়া, জীবনের একঘেঁয়ামী কাটানোর পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদ যদি জীবনের একটা উদ্দেশ্য হয়ে বসে, তাহলে কুরআনে পরিভাষায় সেটাকে ‘লগ্ব’ (বৃথা, নিষ্ফল) বলেই নিন্দা করতে হবে। আমোদ-প্রমোদ যখন জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মকে ব্যাহত করতে থাকে অথবা কারো সময় নষ্ট করতে থাকে, যে সময়টাকে সে ভাল কাজে ব্যয় করতে পারতো, তাহলে আরবী ‘লগব’ শব্দের তাৎপর্য অনুযায়ী সেটাকেও বৃথা বলেই অভিহিত করতে হবে।

টেলিভিশন সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা তো সারাটা দিন সেই বাক্সটার দিকেই চোখ লাগিয়ে বসে থাকে। কাজকর্ম থেকে ফিরে এসেই লোকেরা টিভি সেটের সামনে বসে পড়ে, তা সে প্রোগ্রাম যাই হোক না কেন। এতে করে তাদের ছেলেমেয়েরে প্রতি, স্ত্রীর প্রতি এবং বন্ধুবান্ধব তথা গোটা সমাজের প্রতি, তাদের যে দায়িত্ব তারা তা অবহেলা করছে। ফলে টিভি এখন একটা আধুনিক অভিশাপে পরিণত হয়েছে। এ যুগে টিভি দেখে এত বেশী সময় নষ্ট করা হচ্ছে যে, কারো পক্ষে এর ভাল-মন্দ নিরূপণ করাই কঠিন, বরং দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবু এটাই যদি সবটা হতো, তাও নয়। টিভিতে প্রদর্শিত অপরাধ চলচ্চিত্রগুলোতে প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধের ভাবমূর্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, তা ছেলেমেয়েদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো সৃষ্টি করেই না, বরং তার উল্টোটাই করে। এমনকি, ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ করে তৈরী প্রোগ্রামগুলোতেও প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জনপ্রিয় চরিত্রগুলোর দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত দুষ্ট কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে কুফলই ছড়াচ্ছে বেশী, যার দরুন বাড়ীর মধ্যেই শান্তি বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই প্রোগ্রামগুলো যতই আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক হোক না কেন, এগুলো কোনক্রমেই শিক্ষামূলক নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, এই প্রোগ্রামগুলো দেখার কারণে বহু অবাধ্য শিশু জন্ম নিচ্ছে এবং তারা ভবিষ্যতে অপরাধী হওয়ার ক্ষমতা (Potentiality) নিয়েই বেড়ে ওঠছে।

বয়স্কদের জন্য নির্মীত প্রোগ্রামগুলোতে অপরাধ সংঘটনের জন্য উদ্ভাবিত কলাকৌশলগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবেই শেখানো হচ্ছে। হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকময় অবসর জীবন কেমন হওয়া উচিত, তা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দঘন করে প্রদর্শিত হচ্ছে যে, তাতে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। হায়! কল্পনা ও বাস্তবতায় যে ব্যবধান, তার কিছুটা যদি তারা বুঝতো! এবং যদি বুঝতো যে কি হওয়া উচিত আর কি হয়!

যে সকল বৃথা সুখের অন্বেষাকে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে, তার মধ্যে ছোটখাট ও তুচ্ছ ব্যাপারগুলো পড়ে না বলে অনেকে মনে করতে পারে। এটা

এবং আমোদ-প্রমোদের অন্যান্য অনেক রীতি-প্রণালীও সেই আবহাওয়ায় হতাশা ও ব্যর্থতার মাত্রা বাড়াতেই থাকে। যে কেউ ভাবলে অবাক হবে যে, এমনটি যদি হতেই থাকে, তাহলে আরও চরম স্তরে পৌঁছাবে কবে!

কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ

পবিত্র কুরআন কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ চায়। ঈর্ষা যদি অদম্য ও অতৃপ্ত বাসনা-কামনার জন্ম দেয়, তবে তারও অনুমোদন দেয়া যাবে না।

এই শিক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে কামনা-বাসনার সুশৃংখলতা, বিন্যস্ততা ও পরিশীলতা সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইসলাম অবশ্য এমন কোন ধর্ম নয়, যা পলায়নী মনোবৃত্তি সমর্থন করে কিংবা সন্ন্যাস বা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বনের মাধ্যমে সহজাত কামনা-বাসনার নিরোধ 'নির্বাণ' বা বস্তুজগতের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলে। 'নির্বাণ'-এর দর্শনের কথা হচ্ছে, কামনা-বাসনাই আমাদেরকে বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, আমাদেরকে বস্তুবাদিতার দাসে পরিণত করেছে আর এখেকে মুক্তি পেতে চাইলে সমস্ত কামনা-বাসনা নিরোধ করতে হবে।

ইসলাম এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এই জন্যে যে, এই দর্শন মনুষ্য-নির্মীত, অস্বাভাবিক এবং তা সমস্যা সমাধানে অপর্যাপ্ত। 'নির্বাণ'-এর ধারণা (কনসেপ্ট) শাস্তির চাইতে মৃত্যুর বেশী কাছাকাছি। এক্ষেত্রে ইসলামের সম্পূর্ণ আলাদা সমাধান রয়েছে। ইসলামের মতে, জীবনের প্রহেলিকা বা মায়া অপসারণের লক্ষ্যে কামনা-বাসনাকে হত্যা করাটা কোন সমাধান নয়।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক ব্যবস্থার কথাই বলা হযেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই উপদেশ যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তিগুলোকে সুসংহত করা, সীমিত রাখা এবং বাগে রাখা। অন্যথায়, সকল কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে কোন মানুষের পক্ষেই শান্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। আগেই যেমন বলা হয়েছে, কামনা-বাসনার নাগাল পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে আপতঃদৃষ্টিতে যত সামান্যই মনে হোক না কেন, এগুলোর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অত্যন্ত কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন করীমে উপদেশ দেয়া হয়েছেঃ

"এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি, তার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করে দেখবে না, (কারণ, এইসব উপকরণ তাদেরকে এজন্যই দেয়া হয়েছে) যেন আমরা তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করি আর তোমার প্রতিপালকের দেয়া রিয্‌কই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।" (তাহা-২০:১৩২)

পবিত্র কুরআন অপরের সম্পর্কে অতিরিক্ত সন্দেহ বা কুধারণা পোষণ করতে, ছিদ্রান্বেষণ করতে বা নাক গলাতে এবং গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা করতে নিষেধ করেছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহ পরিহার কর। কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করবে না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করে বেড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে? অবশ্যই এটাকে তোমরা ঘৃণা করবে, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।" (আল্‌ হুজুরাত-৪৯:১৩)

ট্রাস্ট গঠন এবং ট্রাস্ট ও চুক্তির অলংঘনীয়তা

ইসলামী সমাজে ট্রাস্ট স্থাপন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামি সমাজে ঐক্যের যে ধারণা (Concept of Unity), তাতে ট্রাস্ট বা আমানত এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির অলংঘনীয়তা একটা মৌলিক বিষয়রূপে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"মুমিন তারাই, যারা নিজেদের আমানত (বা ট্রাস্ট)সমূহের এবং অঙ্গীকার (বা চুক্তি) সমূহের প্রতি যত্নবান (সতর্ক)।" আল্‌ মুমেনূন-২৩:৯)

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’
- ইমাম মাহদী (আ.)

“ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই”
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৭৪)

বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের আহবান

(৪) ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত রূপক বর্ণনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংক্রান্ত বিভ্রান্তি:

পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে জানা যায় যায় যে, মুসলিম উম্মতের মধ্য থেকেই মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে নেতৃত্ব দানকারী খলিফা, মোজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফায়ে রাশেদীন, তারপর প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারক রূপে মোজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সংস্কারমূলক কার্যপরিধি এবং পৃথিবীব্যাপী ইসলাম প্রচারের দায়িত্বের গুরুত্বের কারণে একাধারে “মুজাদ্দিদ”, ‘ইমাম মাহদী’ ও ‘মসীহ মাওউদ’– এই তিনটি পদবী ও উপাধী দ্বারা বিশেষভাবে ভূষিত হয়েছেন। আরো উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মেও বিভিন্ন নাম ও উপাধীবিশিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী মহাপুরুষের আগমনকাল, তাঁর পরিচয়, সামসাময়িক যুগের বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী, তাঁর সত্যতার সমর্থনে যমীন ও আসমানে প্রকাশিতব্য বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ, তাঁর মোকাম ও মর্যাদা, কার্যপরিধি ও চূড়ান্ত সাফল্য, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সম্পর্কে যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদান এবং সেগুলির পর্যালোচনা করার পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ঐশী-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে একটি নীতিগত বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে যথেষ্ট পরিমাণে উপমা এবং প্রতীক বা রূপকের ব্যবহার হয়ে থাকে এবং পরোক্ষ পদ্ধতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ ইশারা ও ইঙ্গিত মিশ্রিত থাকে। এই বিষয়ে কয়েকটি বিবেচ্য বাস্তবসম্মত দিক হলো:

(১) যদি এরূপ রূপকবর্ণনা-পদ্ধতি গ্রহণ করা না হতো, তা'হলে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ব্যক্তির পক্ষে শৈশবে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করা এবং যথাসময়ে ঐশী প্রত্যাদেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হতো।

(২) শাব্দিকভাবে এবং সরাসরিভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা ব্যবহৃত হলে সাধারণ মানুষের জন্য ঈমানের পরীক্ষারও প্রয়োজন হতো না।

(৩) রূপক এবং পরোক্ষ পদ্ধতি ও নীতি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতেও অনুসৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামের অব্যবহিত পূর্বে আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কথা বলা যেতে পারে। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে যখন হযরত ঈসা (আ.) আগমন করলেন, তখন সমসাময়িক ইহুদী পণ্ডিতগণই তাঁর সর্বাধিক বিরোধিতা করলেন এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করলেন। আগমনকারী যীশুখৃষ্ট তথা হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদীরা অদ্যাবধি গ্রহণ করে নাই। এখন পর্যন্ত ইহুদীরা তাদের জন্য প্রত্যাদিষ্ট পরিত্রাণকারীর আশায় ‘Wailing Wall’ তথা ‘ক্রন্দন প্রাচীরে’ প্রতি বছর কান্নাকাটি করে যাচ্ছে।

(৪) বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে তৌরাত (Old Testament) ও ইঞ্জিল (New Testament) উভয় গ্রন্থে যথেষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল (সূরা আরাফ: রূকু-৯ এবং আয়াত ১৫৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ইহুদী ও খৃষ্টানগণই অস্বীকৃতি ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। তৌরাতের এরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে: (ক) ‘দ্বিতীয় বিবরণী বা ‘ডিউটারোনমি’ ১৮:১৫, ১৮:১৮-২০ এবং ৩৩:২ পদগুলিতে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হতে এক মহাগৌরবসম্পন্ন ‘মুসাসদৃশ’ (‘Like unto Moses’) মহানবীর ‘পারান’ (আরবীতে ‘ফারান’) উপত্যকা হতে দশ হাজার সাধু ব্যক্তি সমভিব্যহারে একটি শক্তিশালী ‘আধ্যাত্মিক বিধান’ (Fiery Law) সংগে নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (খ) হাবাকুকের ৩:৩-৭ পদে সেই মহানবী সম্বন্ধে ‘পবিত্র সত্তা’ (Holy One) ‘পৃথিবীব্যাপী তাঁর প্রশংসা (The earth full of his praise) এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (গ) সলোমন গীতের ৫:১০ পদে সেই মহানবীর গুণাবলী সম্বন্ধে সর্বোতভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত (Altogether

Lovely বা হিব্রু ভাষায় Mahammaddim) বলে অভিহিত করা হয়েছে। (ঘ) ঈশাইয়ার ৯:৬-৭ পদে তাঁর সম্বন্ধে 'আশ্চর্যজনক' (Wonderful), 'শান্তির রাজপুত্র' ('Prince of Peace) প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। (ঙ) তাঁর আবির্ভাবের ফলশ্রুতিতে তৎকালীন রোমান ও পারশ্য সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী দানিয়েল কেতাবের ২:৩১-৪৫ পদগুলিতে রূপকের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

(৫) অনুরূপভাবে, ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের বিভিন্ন বর্ণনাতেও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে: (ক) মথি ২১:৩৩-৪৬ পদগুলিতে বনী–ইস্রায়েল হতে খোদার রাজত্ব অন্য জাতিতে স্থানান্তরের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ২৩ ঃ৩৮–৩৯ পদে যীশুর পরে মহানবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (খ) যোহন ১:২১ এবং ১৪:২৬ এবং ১৬:৭-১৪ পদসমূহে আগমনকারী মহানবীকে 'শান্তিদাতা' (Comforter) ও 'সত্যের আত্মা' (Spirit of Truth) বলা হয়েছে। (গ) লুক ২৪:৪৯ পদে খোদার অন্য একটি প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। (ঘ) অ্যাকটস ৩:২১-২৪ পদগুলিতে প্রতিশ্রুত মহানবীর (সা.) উল্লেখ রয়েছে।

উপরোক্ত নীতির আলোকে বর্তমান যমানার জন্য প্রতিশ্রুত মহামানব অর্থাৎ 'মোজাদ্দিদ' (ধর্ম সংস্কারক), 'ইমাম মাহদী' (সৎপথ-প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক নেতা) এবং 'মসীহ মওউদ' অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ বা প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও পরীক্ষা করাই যুক্তিসংগত। অন্যথায়, শুধুমাত্র আক্ষরিক এবং বাহ্যিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ব্যাখ্যা করলে এবং অতীতের ঘটনাবলীর আলোকে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্যপ্রমাণগুলির বিশ্লেষণ না করলে অতীতের ন্যায় আজও বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে।

ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) সম্পর্কিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টান্ত

হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণ হলো রূপকাবৃত কতগুলো বর্ণনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার উপর অনেকেই বেশি গুরুত্বারোপ করেন। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

(১) পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আখেরী যুগে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় আগমন করবেন। শাব্দিক অর্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতার জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনরাগমন সম্ভব নয়। ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(২) সূরা নূরের ৭ম রুকুতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইমানদার এবং সৎকর্মশীল মুসলিম উম্মাহর জন্য খেলাফতের সংগঠন একটি ঐশী প্রতিশ্রুত বিষয়, যেভাবে পূর্ববর্তী মূসায়ী শরীয়তে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে। অনুরূপভাবে, মোহাম্মদী উম্মতে আখেরী যুগে ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(৩) পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে আখেরী যুগে (হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভাবের প্রাক্কালে) জমিন ও আসমানের অনেক লক্ষণ ও চিহ্নাবলী এবং বিশেষ নিদর্শনাবলী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে।

(৪) ইসলামের পূর্ণপ্রচার এবং প্রতিশ্রুত মহাবিজয় সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (পবিত্র কুরআন ৪৮:২৯-৩০, ৬১:৯-১০ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)। হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর কার্যাবলী সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–আবির্ভূত হয়ে কতক বিশেষ কার্যাবলী সম্পাদন করবেন: (ক) ক্রুশ ধ্বংস করবেন; (খ) শুকর বধ করবেন; (গ) যুদ্ধ রহিত করবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মোকাবেলা করবেন (ঘ) দাজ্জাল বধ করবেন; (ঙ) অঢেল ধনসম্পদ বিতরণ করবেন ইত্যাদি।

(৫) বুখারী ও অন্যান্য হাদীসে বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। 'ঈসাসদৃশ' অর্থাৎ মসীলে ঈসার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(৬) দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি? এতদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করলে সেগুলো হবে খুব অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। রূপকার্থে এগুলো বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে।

(৭) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং সুদূরপ্রসারী তত্ত্ব ও তথ্যের ইঙ্গিত বাহক।

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এবং রূপক বর্ণনার তাৎপর্য কি? এই বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে জানা দরকার এবং এগুলোর সুগভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। অতীতের ন্যায় বর্তমান যুগেও ভাসাভাসা জ্ঞানবিশিষ্ট তথাকথিত আলেমগণ ভবিষ্যদ্বাণীর রূপক এবং প্রতীকি বর্ণনা এবং উপমা ও সাদৃশজনিত ভাষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে চরম বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করতে কার্পণ্য করছেন না।

[চলবে]

ডাঃ নাজিফা তাসনিম
বি ডি এস (ডি ইউ)
পি জি টি (বি এস এম এম ইউ)
ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী
বি এম ডি সি রেজিঃ 4299
মেডিক্যাল অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন
(বারডেম পরিবারভূক্ত শাখা)
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার ঃ
হলি ল্যাব হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
কুমারশীল মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইল : 01711-871473
রোগী দেখার সময় ঃ
প্রত্যহ বিকাল ৪টা - রাত ৮টা
শুক্রবার সকাল ১০টা-দুপুর ১টা ও
বিকাল ৪টা - রাত ৮টা

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১০ম কিস্তি)

মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের আলেম এবং সদা হাসিমুখ ব্যক্তি। অন্য যেকোন ব্যক্তির সাথে তিনি যখন কথা বলেন, তখন মনে হয় তিনি ছোট আর যার সাথে কথা বলছেন সে তাঁর চেয়ে বড়। বক্তৃতার দায়িত্ব নেয়া থেকে দূরে তিনি থাকতেন, পাশ কাটিয়ে যেতেন। একবার একদিন মসজিদ মোবারকে কুরআনের দরস দিয়েছিলেন। আমার এখনো স্মরণ আছে, সূরা আহযাবের দরস দিলেন। দরস লিখে এনেছিলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত কথা বলেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি আয়াতের, সম্ভবত ৫/৬ টি আয়াতের তরজমা পড়ে বললেন- এ আয়াত কেন এখানে বর্ণিত হয়েছে বা এর তফসীর কী, তা বলতে পারছি না। হাদীস, কুরআন, আরবী ভাষায় তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী। জামেয়া পাশ করার অনেক পর পর্যন্ত অনেক দিন রাবওয়ায় বসবাস করেছি। একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আরবী বই ‘কেরামাতুস সাদেকীন’, কঠিন আরবী বই, তাঁর কাছে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। প্রতিদিন তিনি আসরের নামাযের পর মসজিদ মোবারকে এক পৃষ্ঠা বই পড়াতেন। কিছুদিন পরই কি কারণে স্মরণ নেই, পড়াটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মোহতরম মীর মাহমুদ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের গভীরতার কথা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি ওস্তাদ, তিনি ভাই, তিনি বন্ধু, তিনি আমার অনেক আপনজন, অনেক প্রিয়জন। এখনো তাঁর সাথে যোগাযোগ আছে। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করেন। ২০০৫ সালে কাদিয়ান জলসায় বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল। মসজিদ মোবারকে প্রথমবার নামাযের পর তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। আমার পা নাই তিনি জানতেন। নকল পায়ের দিকে ইশারা করলাম। তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে ডাকলেন, ছেলের নাম ভুলে গেছি। ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বড় ছেলেদেরকে চিনি, পরিচয় আছে। কিন্তু ছোট ছেলে রাবওয়ার যুগে বেশী ছোট ছিল তাই চেনা-জানা ছিল না। ছেলেকে আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমাকে সে চেনে কিনা। ছেলে মাথা নাড়ল যে সে আমাকে চেনে না। মীর সাহেব বললেন, ‘ইনাকে না চিনলে তোমার গুনাহ হবে’। তারপর আমার পরিচয় ছেলেকে বললেন। (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা)। আমাকে না চিনলে কোন গুনাহ হবে না। এটা কেবল আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালোবাসার পরিচয়।

তিনি অনেক বছর জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন। ২০০৮ সালে খেলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে জামেয়ার পক্ষ থেকে স্মরণিকা বের করেছিলেন। খাকসারকে পয়গাম দিলেন যেন ফটো পাঠাই। ফটো পাঠাতে দেরী হল কয়েকদিন। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমার ফটো পেয়ে ঐ ফটো স্মরণিকায় প্রকাশ করলেন। আমার ফটোর নিচে নামের সাথে ‘প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ’ও লিখেছেন। জাযাকুমুল্লাহ। আরো কয়েকজন বিদেশ-ফেরত বড় মাওলানা বিভিন্ন সময় জামেয়ায় কিছুকাল পড়িয়েছেন। যেমন, মোহতরম মাওলানা নূরুল হক আনোয়ার সাহেব, মোবাল্লেগ আমেরিকা, মোহতরম মাওলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব মোবাল্লেগ ইনচার্জ পশ্চিম আফ্রিকা, মোহতরম মাওলানা ফজলে এলাহী বশির সাহেব, মোবাল্লেগ ফিলিস্তিন।

সারা পৃথিবীর মুরুব্বীগণ তাদের বুযুর্গ শিক্ষকগণের জন্য দোয়া করে থাকেন। জামেয়ায় অধ্যয়নের যুগকে আমরা কখনও ভুলব না। আল্লাহ্ তা’লা চিরদিন রাবওয়ার সম্মান সমুন্নত রাখুন।

“রাবওয়া রাহে কা’বা কি বড়াই কা দোয়াগো
কা’বা কি পৌঁছতি রাহে রাবওয়া কো
দোয়ায়েঁ।”
অর্থঃ কা’বা শরিফের উচ্চতা সমুন্নত রাখতে
রাবওয়া দোয়ারত থাকবে।
কাবা শরিফের দোয়া রাবওয়া পেতে থাকুক।
(কালামে মাহমুদ)

এই অধম সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী ছাড়াও জামাতের বুযূর্গ ব্যক্তিবর্গের দোয়া পাওয়ার আশায় নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছি। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (খেলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে), সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, মোহতরম মির্যা আব্দুল হক্ব মরহুম (সারগোধার আমীর), হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধারী সাহেব মরহুম, মাওলানা কাযী মহাম্মদ নাযির লায়ালপুরী মরহুম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে আমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছি।

জামেয়ার শেষ বর্ষের ছাত্রদেরকে বিভিন্ন জামাতে সফরে পাঠানোর নিয়ম ছিল। মুসলেহ মাওউদ দিবসের জলসা উপলক্ষে হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধারী সাহেবের সাথে আমার লাহোর জামা’তে

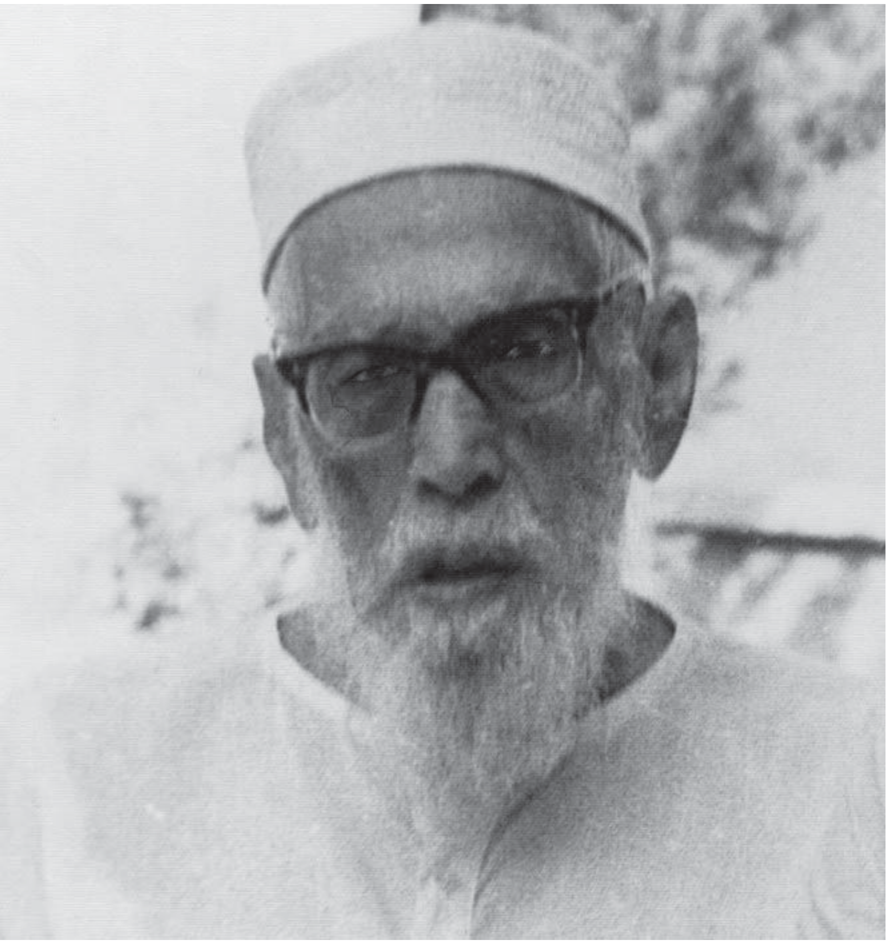

হযরত মৌলবী মোহাম্মদ দীন (রা.)

যাবার সুযোগ হয়েছিল। জলসায় বক্তৃতা করারও সুযোগ হয়েছে। এক সাথে সফর করার সময় অনেক কিছু দেখার এবং শেখার সুযোগ পাওয়া যায় এবং আমিও পেয়েছি।

মোহতরম আব্দুর রহমান খান বাঙ্গালী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ আমেরিকা একজন বড় বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে বি.এ.এল.এল.বি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ান গিয়ে দরবেশী জীবনযাপন করেছিলেন। কাদিয়ান হাইস্কুলে ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। অবসর গ্রহন করার পর হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে আমেরিকায় মোবাল্লেগ ইনচার্জ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। খান সাহেব তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ছুটিতে রাবওয়া এসেছিলেন। তখন তার সাথে কয়েকবার দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনিই সর্বপ্রথম আমাকে বলেছিলেন, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখতে হয়। আমি বড় আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলাম যে, হুযুরকে কি লিখব? তিনি কত উঁচু পর্যায়ের মানুষ আর আমি কত নিচে! কি লিখব? খান সাহেবের ইংরেজি লেখা সম্পর্কে একজন আমেরিকান আমাকে বলেছিলেন যে, আব্দুর রহমান খান সাহেবের ইংরেজি লেখা পড়ে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। তাঁর ভাষা খুবই মধুর।

মোহতরম চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন বি.এ. জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ানে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে রাবওয়াতে এসে থেকেছেন। তিনিও বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। **‘রিভিউ অব রিলিজিওনস’**-এর সম্পাদক ছিলেন। কুরআন করীমের ইংরেজি তরজমা প্রকাশের সময় তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এক সময় মুসলেহ মওউদ (রা.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভাল দক্ষতা রাখতেন। বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। কোন টাকা নিতেন না। একবার হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর নির্দেশে তিনি পূর্ব বাংলা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে ঢাকায় কয়েক বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৬ সনে বর্তমান ৪নং বকশী বাজার রোডের দারুত তবলীগের বাড়ি ও জমি তাঁর চেষ্টায় ক্রয় করা হয়েছিল। তিনি এখানে ভাড়া থাকতেন। খাকসার রাবওয়া যাওয়ার পর শুরু থেকেই তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তিনি আমার জন্য অনেক দোয়া করতেন। আরো অনেক বুযূর্গ মোবাল্লেগদের স্নেহ ও দোয়া পেয়েছি। সবার কথা বর্ণনা করতে গেলে লেখা অনেক দীর্ঘ হবে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ

জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশোনার সাথে সাথে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবায়ে কেরামের সাথে দেখা করে দোয়া চাওয়ার চেষ্টা করেছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুত্র সন্তানদের কারো সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয়নি। হযরত মির্যা বশিরূদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে ইন্তেকাল করেন। আমি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বড় মেয়ে সাহেবযাদী নবাব মোবারেকা বেগম (রা.) এর সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ রেখেছিলাম। তাঁর স্বাক্ষরিত অনেকগুলো পত্র আমার কাছে আছে। একবার নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা তাঁর পৌত্র নবাব মনসুর আহমদ খান সাহেবের মাধ্যমে আমাকে মৌখিক পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, **“দোয়া কবুল হতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে হয়”**। মনসুর আহমদ খান সাহেব জামেয়ার সিনিয়র ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে তিনি ওয়াকিলুত তবশীর, তাহরীকে জাদীদ রাবওয়াহ। ১৯৭৬ সনে আমরা দরজা খামেসাতে (ষষ্ঠ বর্ষ) উত্তীর্ণ হলাম। তখন আমি আমার ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করেছিলাম। হযরত মোবারেকা বেগম সাহেবার ঐ পয়গাম তখন মনে পড়েছিল। আমার মত একজন অযোগ্য ছাত্রের জন্য ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন খুবই অসাধারণ বিষয় ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে নিয়মিত দেখা করার চেষ্টা করেছি। একবার এক ডায়েরিতে ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের নাম লিখেছিলাম– যাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ

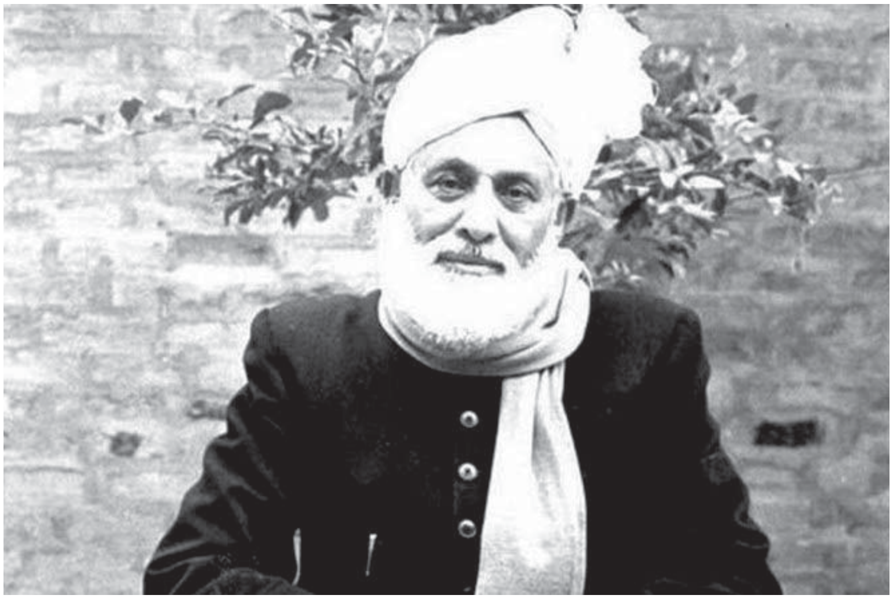

হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রা.)

হয়েছিল। মোট ৩৩ জন সাহাবার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সকলের কাছে কিছু কিছু শিখেছি, অবশ্যই দোয়াও পেয়েছি। কিন্তু এই ডায়েরী এখন আমার কাছে নেই। সবার সম্পর্কে লেখাও সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকজনের সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করছি।

হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সান্নোরী (রা.)-এর জানাযার নামাযে শামীল হয়েছিলাম। তিনি করাচি থাকতেন। আমি রাবওয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পাক্ষিক আহমদীতে পড়েছিলাম।

হযরত হাফেজ সৈয়দ মুখতার আহমদ শাহজাহানপুরী (রা.) এর সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি। আসরের নামাযের পর তাঁর বাসায় যেতাম। তিনি বিছানায় শায়িত থাকতেন। সে সময় আরো অনেকে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। তিনি কুরআনে হাফেজ ও এক বড়পীর সাহেবের সন্তান ছিলেন। আমরা যখন দেখা করতে যেতাম, তাঁর কথায় বোঝা যেত যে, তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও তাঁর গভীর দৃষ্টি থাকত। তিনি উর্দু ভাষার অনেক বড় কবি ছিলেন। আমি রাবওয়া যাওয়ার অল্প সময় পরে প্রায় একশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত কাজী আব্দুল্লাহ্ ভাট্টী (রা.) আমেরিকার মোবাল্লেগ হিসেবে জামাতের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি বি.এ. পাশ ছিলেন। দীর্ঘদিন লঙ্গরখানার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মসজিদে মোবারক থেকে বাড়ি যাবার পথে চলতে চলতে তাঁর সাথে দেখা করেছি, দোয়া চেয়েছি। তিনি তখন খুব দুর্বল ছিলেন। বড় কষ্টে হাঁটতেন। সর্বক্ষণ দোয়া পড়তেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আঞ্জামে আথম' গ্রন্থে যে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, সেখানে হুযুর প্রয়োজনে মুবাহালার মাঠে নামার উদ্দেশ্যে ৩১৩ জন সাহাবীর উল্লেখ করেছিলেন। হযরত কাজী আব্দুল্লাহ্ ভাট্টী (রা.) সেই ৩১৩ জন সাহাবীর একজন ছিলেন। হযরত নবী করিম (সা.) এর বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন সাহাবী শামিল হয়েছিলেন। সেই হিসেবে হুযুর (আ.) ৩১৩ জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, যদিও তখন বেশ কয়েক হাজার সাহাবী ছিলেন।

(চলবে)

বিজ্ঞপ্তী

তালীম দপ্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে **২০১৭ সালে** সর্বশেষ পরীক্ষায় **অংশগ্রহণ করে** ভাল ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আগামী ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৪তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনকারী ৮ম শ্রেণী এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। এ জন্য ইতিমধ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের যে সকল শিক্ষার্থীরা সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য, স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে সে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। তাই এ বিষয়ে আপনাদের সকলকে বিশেষ যত্নবান হওয়ার অনুরোধ করছি। আরও উল্লেখ থাকে যে, কোন শিক্ষার্থী যদি আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম না পান, সেক্ষেত্রে সাদা কাগজে মুল শিক্ষাসনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর আবেদন পাঠাতে পারবেন।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম

ইসলামঃ বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(২য় কিস্তি)

বিশ্বাসগত দিক থেকে ইসলামের কেন্দ্রীয় মূল বৈশিষ্ট: নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়

ইসলামের শিক্ষামালায় তৌহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এটি এখন সর্বস্বীকৃত যে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রীয় মূলবৈশিষ্ট হলো ‘আল্লাহ্‌র একত্ব’। আল্লাহ্ এক আর একতার মূলেও হলেন তিনিই । তাঁর কাছ থেকেই অন্য সবকিছু উৎসারিত হয়ে অস্তিত্বে আসে এবং এসবের স্থায়ীত্ব তাঁরই উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআন মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর গুণাবলী শনাক্তকরণের জ্ঞান দান করে, আর পবিত্র এ ধর্মগ্রন্থই মানবজাতিকে তৌহীদের মহান শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা তা লালন ও পালনের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর অনুপম গুণাবলী উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿٢٣﴾
هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِکُ
الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ
الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿٢٤﴾
هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ
لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا
فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ
الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿٢٥﴾ ع

(সুরা আল হাশর-৫৯:২৩-২৫)

অর্থাৎ– তিনি আল্লাহ। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নাই। (তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত অসীমদাতা, পরম করুণাময়, বার বার কৃপাকারী। (২৩)

তিনি আল্লাহ। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নাই। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রতিবিধানকারী এবং উচ্চ মর্যাদাবান। তারা যা শরীক করে, আল্লাহ এ থেকে পবিত্র। (২৪)

তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী (ও) যথাযথ আকৃতিদাতা। সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (২৫)

সৃষ্টিজগতে বিরাজমান সুশৃঙ্খল ঐকতান তৌহীদেরই প্রতিফলন:

মহান স্রষ্টার ‘একত্ব’-এর দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর নিপুন সৃষ্টিশৈলীর সুশৃঙ্খল সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান ঐকতানে এরই প্রতিফলন ঘটেছে, সহজেই যা অনুমেয় ও অনুধাবনযোগ্য। পবিত্র কুরআনের শুধুমাত্র একটি উদ্ধৃতি এ গুঢ়-রহস্য উন্মোচন করতে যথেষ্ট–

تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡکُ ۫ وَ هُوَ عَلٰی
کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُۨ ۙ﴿٢﴾
الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ
اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ
الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿٣﴾
الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی
فِیۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ
الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ ﴿٤﴾
ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ کَرَّتَیۡنِ یَنۡقَلِبۡ اِلَیۡکَ
الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیۡرٌ ﴿٥﴾

(সূরা আল মূলক-৬৭:২-৫)

অর্থাৎ- পরম কল্যাণের অধিকারী তিনিই, যাঁর হাতে রয়েছে সব আধিপত্য। আর তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২)

মৃত্যু ও জীবন তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মাঝে কর্মের দিক থেকে কে উত্তম? আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল। (৩)

স্তরে স্তরে সাত আকাশ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। রহমান আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি

কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। এরপর আবারও চেয়ে দেখ, তুমি কি কোন খুঁত দেখতে পাও? (৪)

হ্যাঁ, তুমি বার বার চেয়ে দেখ। তোমার দৃষ্টি কেবলই ব্যর্থ ও ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫)

মহাবিশ্বের সুস্থিতি আর সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির মূলে রয়েছে 'তৌহীদ':

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে –

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ (٢٣)

(সূরা আল আম্বিয়া-২১:২৩)

অর্থাৎ- (আকাশ ও পৃথিবী) এ দু'য়ের মাঝে যদি আল্লাহ ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো, তাহলে নিশ্চয় দু'টোই (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী) বিশৃঙ্খলায় ধ্বংস হয়ে যেত । অতএব তারা যা আরোপ করে, আরশের মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ এর ঊর্ধ্বে। (২৩)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ
اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا
بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ۙ (٩٢)
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۧ (٩٣) ع

সূরা আল মু'মিনূন-২৩:৯২-৯৩)

অর্থাৎ- আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্যও নাই। এমনটি হলে প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টিকে নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেত এবং তারা একে অন্যের উপর অবশ্যই চড়াও হতো। তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, (৯২)

যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। (৯৩)

লক্ষ্যনীয় হলো উল্লেখিত বিষয়াদির দৃষ্টান্ত গ্রীক, হিন্দু ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

একতা মানবজাতির অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট:

কুরআন করীমে মানুষের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতি বারবার গুরুত্বারোপ করে তাকিদপূর্ণ উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (٢)

(সূরা আন নিসা-৪:২)

অর্থাৎ– হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন-নিবেদন করে থাক। আর তোমরা (বিশেষভাবে) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

একই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢٢)

(সূরা আর রূম-৩০:২২)

অর্থাৎ- আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এ-ও হলো একটি নিদর্শন) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি লাভের জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেমপ্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে। (২২)

এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لٰعِبِيْنَ (١٧)
لَوْ اَرَدْنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّاۤ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ (١٨)

(সূরা আল আম্বিয়া-২১:১৭-১৮)

অর্থাৎ- আর আমরা আকাশকে ও পৃথিবীকে এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। (১৭)

আমরা যদি কোন কিছু বিনোদনরূপে গ্রহণ করতে চাইতাম আর তা যদি করারই হতো তবে অবশ্যই আমাদের নিজ সত্তায় (তা) করে নিতাম। (১৮)

আবার,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ؕ (٢٨)

(সূরা সাদ-৩৮:২৮)

অর্থাৎ আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তা বৃথা সৃষ্টি করি নি। এ হলো কেবল অস্বীকারকারীদের ধারণা। অতএব, অস্বীকারকারীদের জন্যে রয়েছে আগুনের (আযাবের) দুর্ভোগ। (২৮)

সৎকর্ম সাধনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে মানুষকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে–

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ (٢٣)

(সূরা আল জাসিয়া-৪৫:২৩)

অর্থাৎ- আর আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। (২৩)

ইসলামে সত্য ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার ভারসাম্যপুর্ণ এক সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে:

বিশ্ব চরাচরে বিরাজমান ভারসাম্যের এ বিষয়টি বুঝাতে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে উল্লেখ করেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ
شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ
مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٦﴾ ع ١٧

(সূরা আল হাদীদ-৫৭:২৬)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আমাদের রসূলদেরকে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব এবং মানুষকে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ন্যায়বিচারের তুলাদন্ডও অবতীর্ণ করেছি। আর আমরা লোহাও অবতীর্ণ করেছি। এতে রয়েছে যুদ্ধের মারাত্মক উপকরণ এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। আর (এর সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো) তিনি যেন তাদেরকে স্বতন্ত্র করে দিতে পারেন, যারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। (২৬)

স্বর্গ বা জান্নাতকে তিনি এমন উঁচু মানের মার্গে উন্নীত করেছেন, যে মর্যাদার মানে মানুষের পৌঁছা উচিত। তবে সেই মান অতিক্রম করে যাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। সুতরাং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর, যাতে ঘাটতিতে পড়ে না থাক।

ঈমান আনার ক্ষেত্রে সকল নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন ইসলামে আবশ্যিক হয়ে থাকে:

আল্লাহ্‌র একত্ব বা তৌহীদ হচ্ছে শক্তিশালী এক নিয়ামক, এর মাধ্যমে মানবজাতির পরস্পরের মাঝে কল্যাণকর সম্পর্ক আর উন্নয়ন একসাথে একই দিকে ঘটাতে মানুষের ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়। তবে ইসলাম কেবল বৈষয়িক উন্নতিতেই থেমে থাকে না, বরং এরও চেয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনা ও বিধিবিধান এর শিক্ষামালায় রয়েছে। এর নীতিমালা শুধুমাত্র মানুষের বস্তুগত চাহিদা মেটানোর নিয়মকানুন বেঁধে দেয়ার ক্ষেত্রেই নয় বরং কালের প্রবাহে তার আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য দূরদর্শী নির্দেশনাসমৃদ্ধ বিধিমালাও এতে প্রদান করা হয়েছে। এরই ফল হলো , ইসলাম কেবল মহানবী (সা.) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশবাণীর সত্যতা ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার বিশ্বাসেই বিশ্বাসী নয়, বরং সমস্ত নবীদের সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সমস্ত ঐশ্বরিক নিদর্শনের সত্যতার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। নিশ্চিতকারী আয়াতসমূহে এ বিষয়টির উল্লেখ কুরআন মজীদে বারবার করা হয়েছে। যেমন–

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ
عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ
مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٥﴾

(সূরা আলে ‘ইমরান-৩:৮৫)

অর্থাৎ- তুমি বল, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি। আর আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও (তাদের) বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মূসাকে, ঈসাকে এবং (অন্যান্য) নবীদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে (আমরা তাতেও ঈমান আনি)। আমরা এদের কারো মাঝে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী’। (৩: ৮৫)

পূর্বকালে অবতীর্ণ ঐশীবাণী সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় ইসলাম কতবেশী অগ্রবর্তী অবস্থানে রয়েছে তা নিম্নের আয়াতটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে :

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ
هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ
شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

(সূরা আল মায়েদা-৫:৪৫)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমরা তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে হেদায়াত ও নূর ছিল। আল্লাহতেই আত্মসমর্পিত নবীরা এ দিয়ে ইহুদীদের মাঝে মীমাংসা করতো। আর একইভাবে আল্লাহভক্ত ব্যক্তিরা এবং (তওরাতের) আলেমরাও (মীমাংসা করতো)। কেননা তাদের উপর আল্লাহর কিতাবের সুরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সাক্ষী ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না, প্রকৃতপক্ষে তারাই কাফির। (৫:৪৫)

একই প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আরো বলা হয়েছে :

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۠
وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ
وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ
وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۭ ﴿٤٧﴾

(সূরা আল মায়েদা-৫:৪৭)

অর্থাৎ- আর তাদেরই (অর্থাৎ উপরে বর্ণিত নবীদের) ধারাবাহিকতায় আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে তওরাতের সত্যায়নকারীরূপে পাঠিয়েছিলাম, যা তার সামনে রয়েছে। আর তওরাতের (যা তার সামনে রয়েছে এর) সত্যায়নকারীরূপে আমরা তাকে হেদায়াত ও নূর সম্বলিত ইনজীল দিয়েছিলাম এবং (তা) ছিল মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ। (৫:৪৭)

ধর্ম মানুষের নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব কল্যাণের পরিবর্তে ধর্ম আজ মানবজাতিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মাঝে নির্যাতন-নিপীড়ন, কলহবিবাদ, দ্বন্দ্বসংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পরার কারণে পরিণত হয়েছে।

অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের উদার মনোভাবকে দ্বন্দ্বসংঘাত মুক্ত পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করা হলে অচিরেই জাতিসমূহের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। অতএব, বর্তমান হীন-অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য শান্তিময় উন্নত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাই তৎপর হবেন, কাঙ্খিত প্রত্যাশা এটাই।

(চলবে)

সংবাদ

তবলীগ খাস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কর্মসূচীর আওতায় অনুষ্ঠিত সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ নভেম্বর শনিবার বাদ মাগরিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের ঘাটুরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হালকা নাসিরপুর, নাসিরনগর মসজিদে তবলীগ খাস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মৌলবী আব্দুস সালাম মোয়াল্লেম। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত, কায়েদ তবলীগ এবং সদস্য সচিব, কেন্দ্রীয় কমিটি। নযম পাঠ করেন এস. এম. নঈম উল্লাহ্, ঘাটুরা। মহানবী হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাওলানা এস. এম. আবু তাহের মোয়াল্লেম, মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং কেন্দ্র থেকে আগত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন মুরুব্বী সিলসিলাহ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুহাম্মদ মুছা মিয়া, প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা আহমদীয়া মুসমি জামাত। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। এতে জামাতের পরিচিতি মূলক লিফলেট পাঠ করেন মৌলবী আব্দুস সালাম মোয়াল্লেম। প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে দোয়া পরিচালনা করেন রিজিওনাল নাযেম আলা মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া, যয়ীম, বিষ্ণুপুর। উক্ত অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ এবং অ-আহমদী মেহমানসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোশারফ হোসেন

মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও এর মসজিদুল মাহদী মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা আল্লাহ্‌র ফজলে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবগণের একান্ত সহযোগিতায় বর্তমানে ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী এ মসজিদে পড়তে আসে। এর মধ্যে ৬ অ-আহমদী। এখানে আরবী শিক্ষার পাশাপাশি নযম শিক্ষা, বক্তৃতা শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা, অর্থসহ নামায ও বিভিন্ন আদব-কায়দা শিক্ষাদান করা হয়।

এ মক্তবের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহদানের লক্ষ্যে গত ৫ ও ৬ অক্টোবর এর মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ৬ অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রশিদ সাহেব প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আফরোজ জাহান কলি-১ম স্থান অধিকারী, নযম পরিবেশন করেন লুবাবা তাবাসসুম আস্থা ১ম স্থান অধিকারীম ও বক্তৃতা উপস্থাপন করেন তৌসিফ আহমদ লাবিব ১ম স্থান অধিকারী। শিশুদের মক্তব্যে পাঠানোর গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মক্তব শিক্ষক মৌ. শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম, এডভোকেট খলিলুর রহমান সাহেবের সঞ্চালনায় প্রতিযোগিদের মাঝে ৫টি বিষয়ে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট সাহেবের নসিহতমূলক বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

আব্দুর রশিদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ৫ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস উদযাপন

গত ০৬/১১/২০১৭ তারিখ হতে ১০/১১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাশ প্রত্যহ বাদ মাগরিব হতে এশা পর্যন্ত চলে। বিশেষভাবে অর্থসহ নামায শিখানো হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়।

আনসারদের কাছে হুযূরের কি প্রত্যাশা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খেলাফতের গুরুত্ব কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় জামাতের আনসারদের করণীয় কি তা-ও আলোচনা করা হয়। প্রত্যহ চা-নাস্তার ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা করেন স্থানীয় যয়ীম ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। ১০/১১/২০১৭ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুয়া দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মিরপুর জামা'তের আমীর মরহুম বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুতে স্মরনসভা অনুষ্ঠিত

মরহুম বি.আকরাম আহমদ খান চৌধুরী
আমীর, মিরপুর জামাত- এর
মৃত্যুতে স্মরণসভা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর

স্মরন সভায় বক্তব্য রাখছেন মরহুমের ছোট ভাই বশির আফজাল আহমদ খান চৌধুরী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের আমীর মোকাররম বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী গত ৫ নভেম্বর, ২০১৭ রবিবার সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে ঢাকা সিএমএইচ এ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৯ বছর।

মরহুম আমীর সাহেব ২০ অক্টোবর ১৯৪৮ সালে নাটোরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আবুল কাশেম খান চৌধুরী উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয় ছিলেন। তাঁর নানাজান এবং পর নানাজান দুজনেই সাহাবী ছিলেন। তারা হলেন খিয়াল, জেহলাম নিবাসী হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান (রহ:) এবং হযরত খান মালিক (রহ:) সাহেব। ২০০৮ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা (আই.) তাঁকে সরাসরি আমীর মনোনীত করেন এবং মিরপুর কে একটি স্বতন্ত্র জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সুদক্ষ পরিচালনায় মিরপুর জামা'ত একটি আদর্শ ও সেরা জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত:পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে এই নব প্রতিষ্ঠিত জামা'তের উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে তালিম-তরবিয়ত ও চাঁদা আদায় সহ সব ক্ষেত্রে মিরপুর জামা'ত একটি অনুকরণীয় আদর্শ জামা'তে পরিণত হয়। তিনি মানুষকে আকর্ষণ করার এক চৌম্বকীয় শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রগাঢ় মায়ার বাঁধনে মিরপুরের সকল সদস্যদের জড়িয়ে রেখেছিলেন। অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে নেয়া ছিল তাঁর অতুলনীয় একটি গুণ।

তিনি নামাযী, তাহাজ্জুদ গুযার, আর্থিক কুরবানীকারী, মুসী ও গরীবের প্রতি যত্নবান, সৎ, নীতিবান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন, সেই সাথে তিনি একজন রসিক মানুষও ছিলেন। তিনি ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন। বিশেষ করে ইসলাম আহমদীয়াত ও খেলাফতের বিষয়ে আমীর সাহেব আপোষহীন ছিলেন। তিনি যেভাবে নিজ পরিবারকে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে আগলে রাখতেন তেমনি মিরপুর জামা'তকেও তিনি নিজ পরিবারের মত করে আগলে রেখেছিলেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তার মৃত্যুতে জামাত একজন সত্যিকারের মুমিনকে হারালো। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই কন্যা ও নাতী-নাতনী রেখে যান। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার জামাতী সকল প্রকার চাঁদা পরিশোধ করেন।

বহুগুনের অধিকারী মরহুমের মৃত্যুতে গত ১০/১১/২০১৭ তারিখে মিরপুর মসজিদে স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের বুযুর্গ ব্যাক্তিগন তার যিকরে খায়ের করেন ও তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মিরপুর জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেব।

–আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

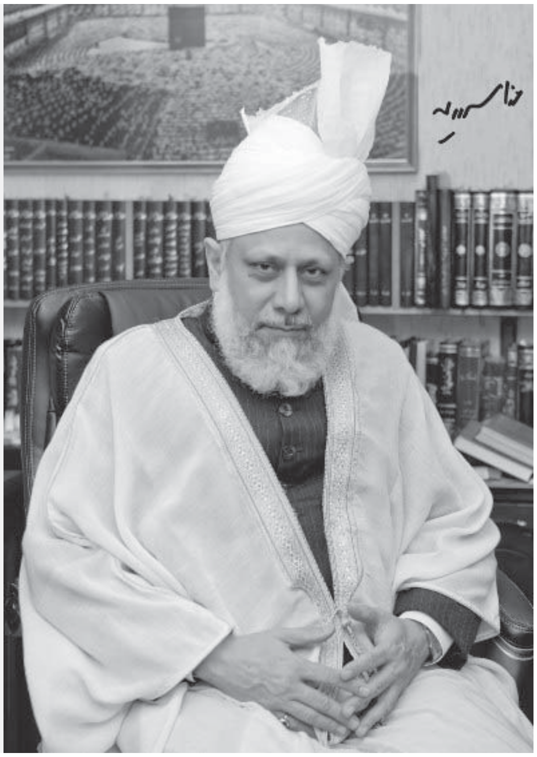

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٢)

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

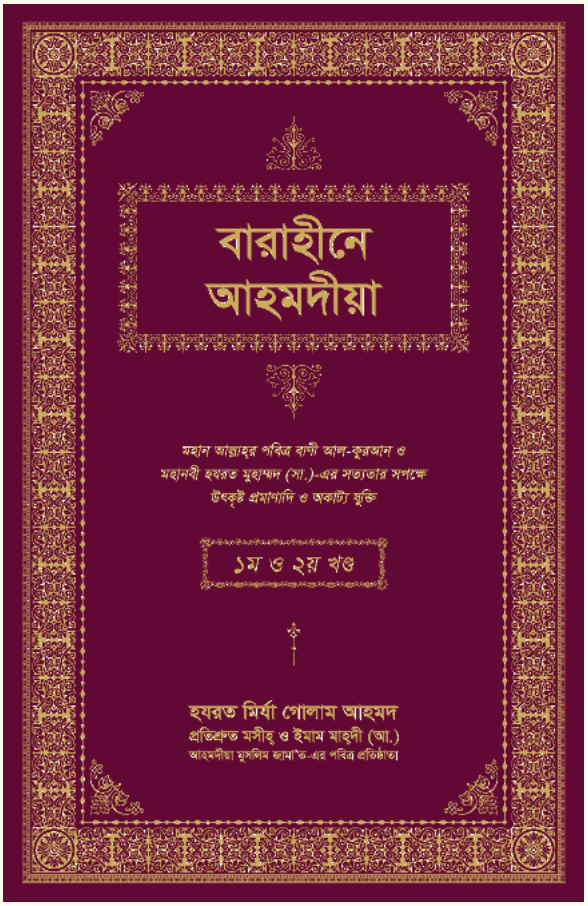
বারাহীনে
আহমদীয়া
মহান আল্লাহ্র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি
১ম ও ২য় খণ্ড
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

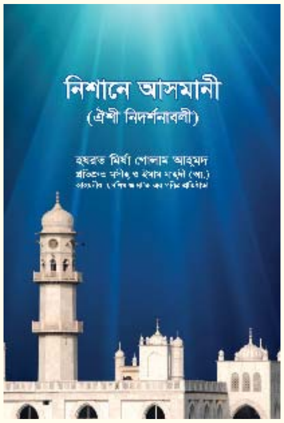
নিশানে আসমানী
(ঐশী নিদর্শনাবলী)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

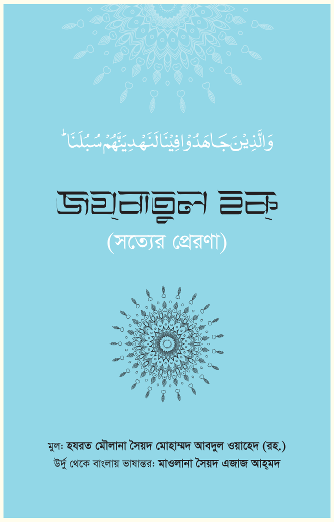
وَالَّذِيۡنَ جَاهَدُوۡا فِيۡنَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا
জয্বাতুল হক্
(সত্যের প্রেরণা)
মুল: হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (রহ.)
উর্দু থেকে বাংলায় ভাষান্তর: মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহ্মদ

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 10th Issue
The Ahmadi Fortnightly
Since 1922
30th November, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করো না

অতএব, বিপদ দেখলে তোমরা আরো সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং নিশ্চয় জানবে যে এটাই তোমাদের উন্নতির পন্থা। তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপয়ে উৎপীড়ন করো না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কারও প্রতি সে তোমার অধীন হলেও, অহংকার দেখিও না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না।

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

“জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা
ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী”

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

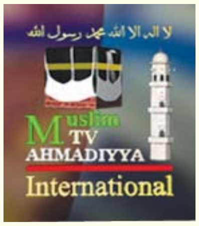

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com